শুকতারা
ঊনাত্রিংশ বর্ষ
দ্বিতীয় সংখ্যা
চৈত্র • ১৩৮২

সর্পরাজের দ্বীপে

কিন্তু সেই কর্মব্যস্ত বন্দরের একধারে এক ছোট অফিসঘরে।

এই কিছু আগে ছেড়ে গেলো! আমি নিজের চোখে বোঝাই হতে দেখেছি

চমৎকার! পরে সঙ্কেত পাঠাচ্ছি!

দুদিন বেশ পরিষ্কার আবহাওয়ায় পুরোনো জাহাজটি তার গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে চললো। তখন----

জাহাজের বাঁ দিকে মনে হয় কিছু দেখা যাচ্ছে!

প্রাক্তন নৌ-অফিসার চট করে তার দূরবীনটা তুলে নিলো।

ঠিক আছে। আমি দেখে নিচ্ছি।

সামুদ্রিক দুর্ঘটনায় বিপন্ন দুটি মানুষ!

পরস্পর বিরোধী চিন্তা ক্যাপ্টেনের মনের মধ্যে সঞ্চালিত হলো।

এখন আমি কি করি? আমার ওপর কড়া নির্দেশ, কোনো কিছুর জন্যেই থামা চলবে না...

কিন্তু দুটো বিপন্ন মানুষকে কি করেই বা ফেলে যাই?

Hard Copy - Shankha Majumder
Scan - Rajashree Dhar
Edit - Optimus Prime

This e-copy is scanned and preserved by
Dhulokhela Team Members

Anyone Can Contribute to our project by
giving their rare magazines for scan.

Reach us at
optifmcybertron@gmail.com

ছেলেমেয়েদের ও বয়স্কদের জন্য কয়েকখানি আকর্ষণীয় বই

দৃষ্টিহীনের

মরণদূতের আনাগোনা ২·৫০

কলিকাতার বিখ্যাত মার্চেন্ট স্যার বিজয়ের খুনের রহস্য……বিখ্যাত দস্যু আনন্দলালের দল কি করে ধরা পড়ল……পড়ুন]

শ্রীযজ্ঞেশ্বর রায়ের

বাহাদুর ১·২৫

[বাঙ্গালীর ছেলে বাহাদুরের দুঃসাহসিক অ্যাড্‌ভেঞ্চার কাহিনী]

সুনির্মল বসুর

ছোটদের পদ্মাপুরাণ ২·৫০

চাঁদসদাগর ও দেবী মনসার অলৌকিক কীর্তি কাহিনী। প্রচুর রঙিন ছবি—একখানি অমূল্য গ্রন্থ]

দৃষ্টিহীনের

বটকালীর জঙ্গলে ২·০০

একটা তামার পাত…এই সামান্য জিনিস নিয়ে গুপ্তধনের লোভে কি জঘন্য হত্যালীলা……]

শ্রীবীরেন দাশের

নরখাদক ১·২৫

কয়েকটি দুঃসাহসিক অ্যাড্‌ভেঞ্চার কাহিনী… পড়তে পড়তে দম আটকে আসে]

শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

অরণ্য-বিভীষিকা ২·৫০

জমিদার কন্যা তারা কেন দস্যু হোল এবং ইংরেজদের কাছে কেন বিভীষিকা হয়েছিল সেই লোমহর্ষক কাহিনী পড়ুন]

হীরেন্দ্রকুমার বসুর

বনে জঙ্গলে ৫·০০

[আফ্রিকার জঙ্গলে বুনো মানুষদের বীভৎস হত্যালীলা কাহিনী

সুবিনয় রায়চৌধুরীর

জীব-জগতের আজব কথা ৩·০০

[পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অদ্ভুত জন্তু-জানোয়ারের বিস্ময়কর গল্প

শ্রীদীনেশ মুখোপাধ্যায়ের

দুঃখজয়ীর জয়যাত্রা ১·০০

বিধবা দুঃখিনী মায়ের পুত্র মিণ্টু মনের জোরে কি করে হাকিম হয়ে দেশে ফিরে এল…পেল বিপুল সম্মান। কিশোর ছেলেদের পড়া একান্ত দরকার

খগেন্দ্রনাথ মিত্রের

দেশ বিদেশের হীরে-জহরৎ ১·২৫

[কতকগুলি রোমাঞ্চকর ঐতিহাসিক গল্প]

শচীন্দ্র মজুমদারের

পথের বন্ধু ১·২৫

[বাঙ্গালী মুষ্টিযোদ্ধা সঞ্জীবকে হেক্সলার কি করে চুরি করে সিঙ্গাপুরে নিয়ে গেল তার দুঃসাহসিক অ্যাডভেঞ্চার

দেব সাহিত্য কুটীরের

পুরানো দিনের পুরানো গল্প ৫·০০

[১৫টি সুন্দর রূপকথার গল্প
দশখানি ভালো ভালো রঙিন চিত্র

দেব সাহিত্য কুটীর ১, ঝামাপুকুর লেন কলিকাতা—৯

বাঁটুল দি গ্রেট

চল লম্বকর্ণ, আমরা কার্ণিভাল দেখে আসি।
চলো বাঁটুলদা!
জল শুদ্ধ মাছ গিলে আবার উগড়ে দিলো! দারুণ, না রে লম্বু?
সত্যি বাঁটুলদা!
ঘুরে ঘুরে খুব খিদে পেয়ে গেছে বাঁটুলদা! চলো, কিছু খাওয়া যাক।
ঠিক বলেছিস লম্বু! চল দেখি কি আছে।
ওদিকে
কার্ণিভালে ফুর্তি করতে এসে বেজ্ঞ ফাঁক, অথচ মজাই জমলো না।
যা বলেছিস মাইরি! কিন্তু রেস্তর একটা হেস্ত নেস্ত করতেই হবে।
আরে সাবাশ! ব্যাঙ্ক মেরে!
কিন্তু বন্ধ যে!
ব্যাঙ্ক
আরে বন্ধ ব্যাঙ্ক খুলতে কতক্ষণ! দাঁড়া, দারুণ একটা আইডিয়া মগজে খোঁচা মেরেছে!
কিছুক্ষণ পরে
এইখানে দাঁড়িয়ে বেশ জোরে জোরে বাজাবে!
ব্যাঙ্ক
বন্ধ ব্যাঙ্কের সামনে বাজনা বাজিয়ে কি কাজ আমাদের হবে গুরু?
ভোঁপ-ভোঁপ!
ঝনাৎ ঝন-ন!
গুম!
গদাম

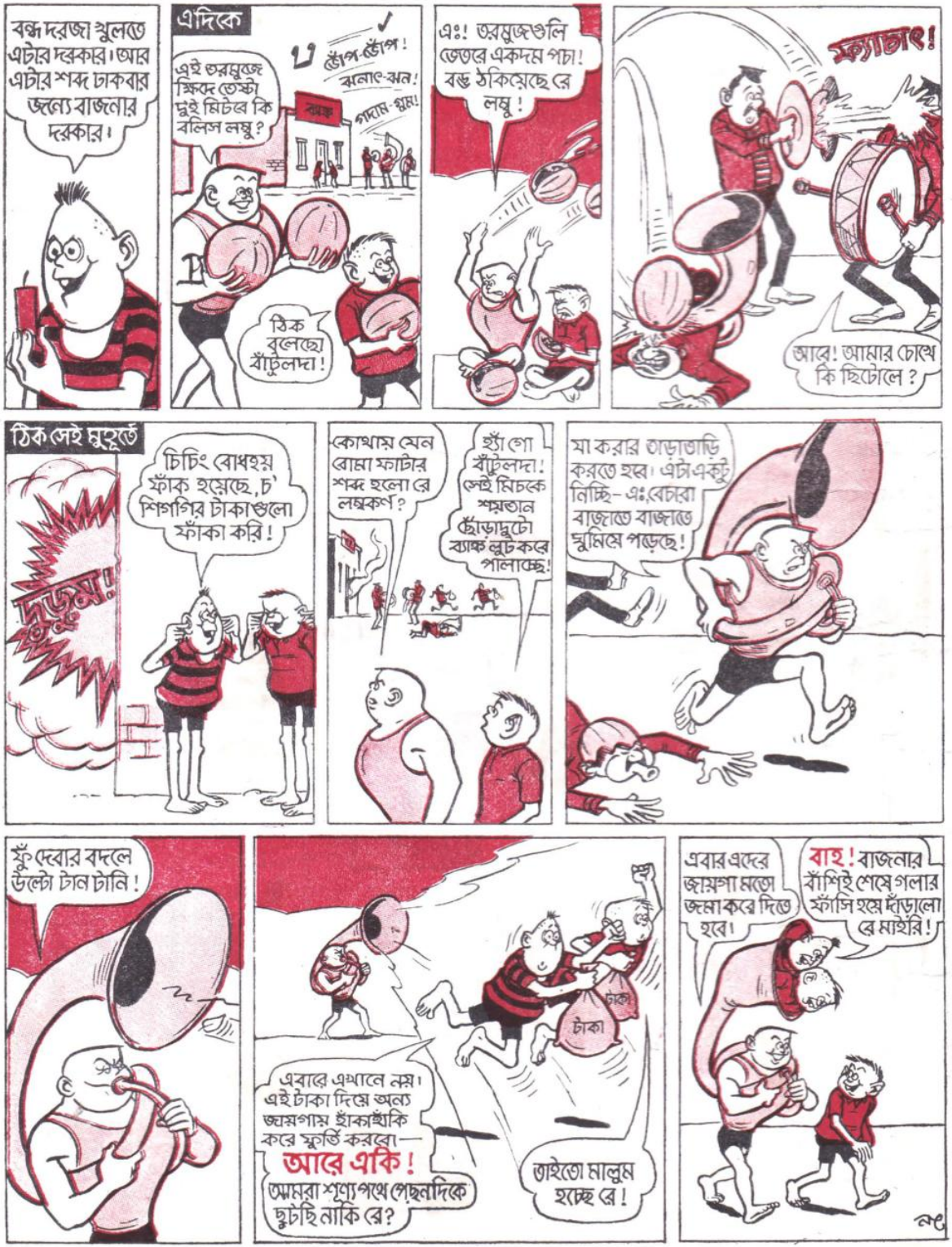

বন্ধ দরজা খুলতে এটার দরকার। আর এটার শব্দ ঢাকবার জন্যে বাজনার দরকার।
এদিকে
এই তরমুজে ক্ষিদে তেষ্টা দুই মিটবে কি বলিস লম্বু?
ভোঁপ-ভোঁপ!
ঝনাৎ-ঝন!
গদাম-গুম!
ব্যাঙ্ক
ঠিক বলেছো বাঁটুলদা!
এঃ! তরমুজগুলি ভেতরে একদম পচা! বড্ড ঠকিয়েছে রে লম্বু!
ফ্যাচাৎ!
আরে! আমার চোখে কি ছিটোলে?
ঠিক সেই মুহূর্তে
দুড়ুম!
চিচিং বোধহয় ফাঁক হয়েছে, চ' শিগগির টাকাগুলো ফাঁকা করি!
কোথায় যেন বোমা ফাটার শব্দ হলো রে লম্বকর্ণ?
হ্যাঁ গো বাঁটুলদা! সেই মিচকে শয়তান ছোঁড়াদুটো ব্যাঙ্ক লুট করে পালাচ্ছে!
যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। এটা একটু নিচ্ছি—এঃ, বেচারা বাজাতে বাজাতে ঘুমিয়ে পড়েছে!
ফুঁ দেবার বদলে উল্টো টান টানি!
টাকা
টাকা
এবারে এখানে নয়। এই টাকা দিয়ে অন্য জায়গায় হাঁকাহাঁকি করে ফুর্তি করবো— আরে একি! আমরা শূণ্যপথে পেছনদিকে ছুটছি নাকি রে?
তাইতো মালুম হচ্ছে রে!
এবার এদের জায়গা মতো জমা করে দিতে হবে।
বাহ! বাজনার বাঁশিই শেষে গলার ফাঁসি হয়ে দাঁড়ালো রে মাইরি!

"শুকতারা"

Approved by the Directorate of Public Instruction, West Bengal as Children's Monthly Magazine Vide, No. 321 (9)-T. B. C.

(Dated 14th August, 1971, 2B-20G/71)

সূচীপত্র—চৈত্র, ১৩৮২

	বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
১।	সর্পরাজের দ্বীপে (সচিত্র চিত্র-কাহিনী)	—নারায়ণ দেবনাথ ...	প্রচ্ছদপট
২।	বাঁটুল দি গ্রেট	—নারায়ণ দেবনাথ	প্রথম ছবি
৩।	ঝটাপটি (কবিতা)	—সুজিত ব্যানার্জী	৮৩
৪।	সরীসৃপ থেকে পাখী (জানবার কথা)		৮৪
৫।	অসম্ভব (গল্প)	—চিত্তরঞ্জন রায়	৮৫
৬।	রূপকথার ফুলঝুরি (গল্প)	—ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য ...	৯০
৭।	আর্কিমিডিস (জানবার কথা) ...		৯৫
৮।	রাজর্ষি লেভেলি (বিদেশী গল্প)	—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা ...	৯৬
৯।	প্রতীক্ষা (কবিতা)	—শ্রীরাজারাম চৌধুরী ...	১০২
১০।	বুনোমানুষ নয় বনমানুষ (গল্প)	—ডঃ রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ...	১০৩
১১।	মজার খেল ...		১১১
১২।	ঘুঘুর ভাই ফাঁদ (ছবিতে গল্প)	—মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায় ...	১১২
১৩।	নতুন জগতে টারজান (অ্যাডভেঞ্চার)	—সব্যসাচী ...	১১৪
১৪।	বীর ছেলে বাংলার (ধারাবাহিক উপন্যাস)	—সুধীন্দ্রনাথ রাহা ...	১২০
১৫।	টমাস আল্‌ভা এডিসন (জানবার কথা)		১২৬
১৬।	পাণ্ডব গোয়েন্দা (গল্প)	—ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ...	১২৭
১৭।	ব্যাঙের ডাক (কার্টুন) ...		১৪৪
১৮।	লোভের সাজা মৃত্যু (প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা)	—পীযূষকান্তি দত্ত ...	১৪৫
১৯।	লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু (দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা)	—দিলীপকুমার সিংহ ...	১৪৭
২০।	"৺সুকোমল সেনগুপ্ত স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা" (ঘোষণা)		১৫০
২১।	মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি) ...		১৫১
২২।	হাঁদা-ভোঁদার গীর্জারোহণ (ছবিতে গল্প) ...		১৫৩
২৩।	আনন্দ আর ধরে না (খেলাধুলা)	—শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫৫

এস. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ ৬৮, কলেজ স্ট্রীট কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও ১১নং শ্যামাপুকুর লেন কলিকাতা হইতে শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীমধুসূদন মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত। মূল্য ১'২৫

জমজমাট মজার আসর

৫০০টি মজার পুরস্কার জিতে নাও!

মণিখানের তারকাটি ✱ প্রতিটি স্কোয়্যারের
ভেতরে রেখে কতগুলি স্কোয়্যার আঁকা যায় বলতে পারো?

শিগ্‌গীর! তোমাদের উত্তর আর সেই সঙ্গে ক্যাডবেরীস্ জেমসের একটি খালি প্লাস্টিক প্যাকেট পাঠিয়ে দাও।

প্রথম ৫০০ জন যারা সঠিক উত্তর পাঠাবে তাদের মধ্যে প্রত্যেকে ক্যাডবেরীস্ জেমসের ১০টি ছোট প্যাক পাবে।

নিজের নাম ও ঠিকানা দিয়ে এই ঠিকানায় উত্তর ভাকে পাঠাও:
"Fun with Gems" Dept. A-
Post Box No. 56 Thane 400 601

রঙ বেরঙের চকলেটে ভরা ক্যাডবেরীস্ জেমস

উনত্রিংশ বর্ষ ২য় সংখ্যা ১৩৮২, চৈত্র

ঝটাপটি

সুজিত ব্যানার্জী

খটাখটি লেগে গেছে যদু আর মধুতে,
রোজ কেন ঢিল পড়ে হারুদের চালেতে ?
যদু বলে মধু রোজ ঢিল ফেলে চালেতে,
শুনে মধু তেড়ে বলে যদু ফেলে রাতেতে।
এই নিয়ে দুজনাতে বেধে গেল তর্ক,
ঝগড়াটা ধীরে ধীরে হল বেশ পক্ক।
যদু বলে দেখ মধু ফের যদি দিস দোষ,
ডাক দেব বাবারে জানিস না তাঁর রোষ।
বাবা তোর শুধু আছে আর বুঝি নাইরে,
মোর জ্যাঠা এল ঐ বিনা হাঁকে এই রে !
যদুটার বুড়ো বাপ কম কিছু যায় না,
[illegible] রোজ দেখে দেখে আয়না।

মধুটার বুড়ো জ্যাঠা যেই তোলে দা খানা,
যদুটার বাপ বলে দা নিয়ে খেলা মানা।
তারপর হাতাহাতি লড়ে দুটো ষণ্ড,
লেগে যায় ঝটাপটি বাপরে কি কাণ্ড।

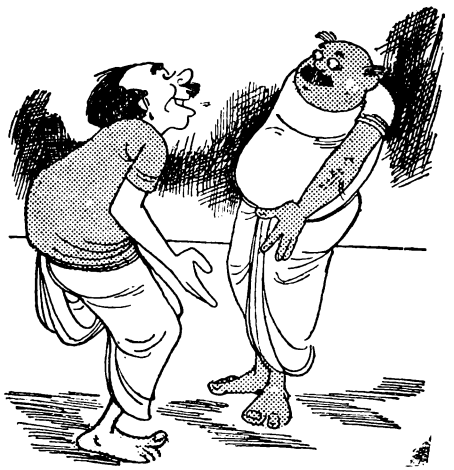

যদুটার বুড়ো বাপ ডিগবাজি দিল যেই,
মধুটার বুড়ো জ্যাঠা ভড়কিয়ে বলে এই।

যদুটার বুড়ো বাপ মনে আঁটে ফনদি—
জ্যাঠাটার সাথে সে করে নেবে সন্ধি।
বুড়ো বাপ বলে যত ওরে শোন ওরে শোন—
মধুটার জ্যাঠা রেগে বলে দূরহ দুশমন।
খিল খিল হেসে বুড়ো বলে মোর ভাইরে,
বড় জ্যাঠা রেগে বলে মুণ্ডটা চাইরে।
তবু বলে বুড়ো বাপ রাগিস না দাদারে,
ভাই বলে ডেকেছিনু তাই রাগ নাকিরে।
আজ থেকে আমি তোর করব না অপমান,
যদি করি তুই মোর মলে দিস দুই কান।
তাই দেখে যদু মধু ফিক ফিক হেসে রয়,
নষ্টের গোড়া জানি তারা ছাড়া কেউ নয়।

সরীসৃপ থেকে পাখী

জার্মানির অন্তঃপাতী সল্‌নোফেনে প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটা শিলীভূত প্রাণিপঞ্জর আবিষ্কৃত হল ১৮৬১ সালে। পরীক্ষা করে পণ্ডিতেরা বললেন, পঞ্জরটা সেই যুগের পাখীর, যে-যুগে সরীসৃপ থেকে পাখীর বিবর্তন সবে শুরু হয়েছে পৃথিবীতে। সেটা হল জুরাসিক যুগ, যখন অতিকায় ডাইনোসরদের রাজত্বকাল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আদ্যিকালের ভূপৃষ্ঠ ক্রমশঃ বর্তমান পৃথিবীর মত রূপ গ্রহণ করছে একটু একটু করে। কঙ্কালটা প্রায় সব দিকেই সরীসৃপ-কঙ্কালের অনুরূপ, কেবল লেজ এবং দেহের উপরার্ধে পালকের চিহ্ন রয়েছে সুস্পষ্ট। তার মস্তিষ্কটা ঠিক সেই রকম, সরীসৃপ থেকে পক্ষিপর্যায়ে উত্তরণের কালে একটা প্রাণীর মস্তিষ্ক যেমনটা হওয়া উচিত। দুই চোয়ালে সরীসৃপের দাঁতের মতই নলের আকারের দাঁত।

এইরকম শিলীভূত পক্ষিপঞ্জর পরে স্পেনের লিরিজ অঞ্চলেও পাওয়া গিয়েছিল। সরীসৃপ থেকে পক্ষীর উদ্ভব-সম্পর্কিত মতবাদের যাথার্থ্য এই দুই জায়গার আবিষ্কারের ফলে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হল।

চিত্তরঞ্জন রায়

যদি কখনও ডাক্তার অনিমেশ চ্যাটার্জীর সঙ্গে বাজার করতে গিয়ে হঠাৎ দেখা হয়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে সেদিন বাজার করতে ঝাড়া দু'ঘণ্টার মত সময় লাগবে। এমনই গল্প করতে ভালবাসেন ঐ ডাক্তার। ভদ্রলোকের স্বভাব-চরিত্র যেমন ভাল, কথাবার্তাও তেমনি মিষ্টি। কিন্তু বেশ কয়েকদিন তাঁকে বাজারে আসতে না দেখে ভাবলাম, তিনি হয়তো বাইরে কোথাও বেড়াতে গেছেন। মাঝে মাঝে এমনি তিনি কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়তেন। তখন কিন্তু কাউকে সঙ্গে নিতেন না। কারণ তাঁর ধারণা, দুজন একসঙ্গে গেলে বিদেশে গিয়ে মতবিরোধের আশঙ্কা থাকতে পারে। অথবা বাইরে কোথাও বেড়াতে গেলে পথের কষ্ট স্বীকার করার যে গুণ থাকা উচিত, তা তার মধ্যে নাও থাকতে পারে। সুতরাং তাঁর ধারণা একাকী যাওয়াই সবচেয়ে ভাল।

কিন্তু একদিন বাজারে গিয়ে হঠাৎ ডাক্তারের চাকরের সঙ্গে দেখা হল। ডাক্তার কোন কারণে বাজারে না এলে কখন-সখন সেই আসত। তার সঙ্গে দেখা হতে দীর্ঘ অনুপস্থিতির কথা জিজ্ঞেস করায় ও বলল, ডাক্তার নাকি অসুস্থ হয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন। চিকিৎসা চলছে, কিন্তু রোগ ধরা যাচ্ছে না। খবরটা শোনা অবধি মনে কোন স্বস্তি নেই। বিকেলে অফিস ছুটির পর ছুটলাম ডাক্তারের বাড়ি। সেখানে গিয়ে দেখলাম, তিনি চুপ করে বিছানায় শুয়ে আছেন। হাতে একটা পুরনো অ্যাস্ট্রলজির বই।

—এ কি ডাক্তার, আপনি এমন অসময়ে শুয়ে? আমি যেন কোন খবরই জানি না তেমনি ভাবে জিজ্ঞেস করলাম।

ডাক্তার আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন—আরে বসুন, বসুন। কখন এসেছেন আপনি?

—ব্যস্ত হবেন না। আমি এই মাত্র আসছি।

এই বলে খাটের পাশে রাখা একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম। তারপর কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললাম—কি হয়েছে আপনার? জ্বর?

—না। শূন্য দৃষ্টিতে ঘরের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার অনিমেশ চ্যাটার্জী বললেন—ডাক্তারদের ধারণা আমি নাকি এক অদ্ভুত ম্যানিয়ায় ভুগছি। কিন্তু I know what has happened to me? অর্থাৎ আমি জানি, আমার কি হয়েছে?

—তাহলে আপনি নিজেই কেন আপনার ট্রিট্‌মেণ্ট করছেন না ?

—যতদূর জানি মেডিক্যাল সায়েন্সে এমন রোগের ট্রিটমেণ্ট নেই, থাকলে নিশ্চয়ই আমি জানতাম।

ডাক্তার চুপ করলেন। এক সঙ্গে অতগুলো কথা বলে তিনি হাঁপাচ্ছিলেন। আমি কোন জবাব দিলাম না। আমার কেবলই মনে হতে লাগল, এটা উন্মাদের পূর্ব লক্ষণ নয় তো! এমন ঘটনা ইতিপূর্বে আমার এক আত্মীয়ের বেলায় ঘটতে দেখেছিলাম। অনেক ওষুধ, অনেক ঝাড় ফুঁক, তেল পড়া, জল পড়া চলল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। শেষ অবধি রোগীকে উন্মাদ অবস্থায় রাঁচীর কাঁকের পাগলা গারদে পাঠাতে হয়েছিল। মানুষ জন কাউকেই সে আমল দিত না, কাছে পেলেই কামড়াতে যেত। সাংঘাতিক হিংস্র প্রকৃতির হয়ে উঠেছিল। যদিও এমন অবস্থা নয় ডাক্তারের, তবু……আর ভাবতে পারলাম না। চিন্তায় ছেদ পড়ল। ডাক্তার হঠাৎ বললেন—কি ভাবছেন অত ?

—তেমন কিছু নয়।

—তাও কী সম্ভব ? আপনি ভাবছিলেন আমার কথা। আপনার আত্মীয়ের মত আমাকেও হয়তো একদিন উন্মাদাশ্রমে ভর্তি হতে হবে। তাই না ?

ডাক্তারের কথায় চমকে উঠলাম। তিনি ডাক্তার বলে কি মানুষের মনের কথাও ধরতে পারেন ?

আমি আর কোন কথা বলতে পারলাম না। চুপ করে রইলাম। আমায় চুপ করে বসে থাকতে দেখে ডাক্তার বললেন—এই হল আমার রোগ। কিছুদিন থেকে আমি মানুষের মনের ভেতরটা জলের মত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এমন কি, যেদিন বাড়ির বাচ্চা চাকরটা দেশে যাবার জন্য ছটফট করছিল, তাকে অনেক করে নিরস্ত করবার চেষ্টা করেছিলাম, ট্রেন দুর্ঘটনার আশঙ্কা আছে বুঝতে পেরে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার কথা না শুনে ট্রেনে করে বাড়ি যাবার পথে সে ট্রেন দুর্ঘটনায় মারা যায়।

—তাই নাকি ? বিস্মিত হয়ে আমি প্রশ্ন করলাম।

—হ্যাঁ, ঠিক তাই। আর সেই কারণেই রোগী-পত্র দেখাও আমি একেবারে ছেড়ে দিয়েছি। কারণ রোগী দেখতে গেলে প্রথমেই স্পষ্ট দেখতে পাই তাদের ভবিষ্যৎটা, যা তাদের জানালে রোগ সারা দূরে থাকুক, ভয়ে ওদের রোগ আরো বেড়ে যাবে।

ডাক্তার চুপ করলেন। দৃষ্টি ঘরের দেওয়ালে নিবদ্ধ। কি যেন গভীরভাবে চিন্তা করছেন তিনি। ঘরের থমথমে আবহাওয়াটা কাটাবার জন্য আমি বললাম—সবই তো বুঝলাম। আপাততঃ কটা দিন চলুন, কোথাও বাইরে থেকে ঘুরে আসি।

—বাইরে ? কোথায় ? ডাক্তার চমকে উঠে প্রশ্ন করলেন।

—পশ্চিমের কোন একটা শহরে যাই চলুন। আমি ডাক্তারকে বললাম।

—কোথায় আর যাব! সারা ভারতবর্ষ আমার ঘোরা। কোন জায়গাই বাদ নেই। ডাক্তার হতাশভাবে জানালেন।

—কিন্তু আমি তো আর যাইনি। ডাক্তারকে বললাম।

ডাক্তার অনিমেশ চ্যাটার্জী বিছানায় অলস-ভাবে শুয়েছিলেন। হঠাৎ খাটের ওপর উঠে বসে বললেন—যাক ভাল কথাই বলেছেন। আরেকবার না হয় গিরিডি থেকে ঘুরে আসা যাক। সেখানে বহুদিন আগে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। কাকতালিয় বলতে পারেন। তারপর তেমন ঘটনা আর বড় একটা আমার জীবনে কোনদিনও ঘটেনি। এবারই কিছুদিন ধরে দেখছি ঘটতে শুরু করেছে।

ডাক্তারকে খুব উত্তেজিত বলে মনে হল। কিন্তু এ কথা মনে মনে ভেবে খুশী হলাম যে, তিনি এতদিনে তাঁর মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছেন। আমায় সঙ্গে নিতে স্বীকৃত হয়েছেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমি ডাক্তারকে বললাম—সে আবার কি রকম ঘটনা ?

ডাক্তার গুম হয়ে বসে রইলেন। কথা বলতে তিনি যেন একেবারে ভুলে গেছেন।

তারপর একসময় হাঁটুর ওপর থেকে মুখটা তুলে বললেন—সেখানে গেলেই সব কিছু জানতে পারবেন। এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ?

যাই হোক, ডাক্তারকে আর বেশী বিরক্ত না করে এক সময় বাড়ি ফিরে এলাম। মনে মনে ঠিক করলাম ব্যাপারটা আমায় যে করেই হোক জানতে হবে।

অবশেষে সত্য সত্যই একদিন ডাক্তারের সঙ্গে গিরিডি রওনা হলাম।

বাঙ্গালী অধ্যুষিত ছোট্ট শহর। আশেপাশে কয়েকটি কয়লার খনি আছে। তবে, এখানে শীতের গোড়ায় অনেকে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য আসেন। যাই হোক, আমরা ছোট একটা হোটেলে উঠলাম। হোটেলের মালিক দেখলাম ডাক্তারের পরিচিত। তিনিই প্রথমে নমস্কার জানিয়ে বললেন—কেমন আছেন ডাক্তার চ্যাটার্জী ? বহুদিন আপনার কোন খোঁজ-খবর পাই না। ভাল আছেন তো ?

—ভালই আছি। আচ্ছা, বলতে পারেন কি, কত দিন পরে আবার আপনাদের গিরিডিতে বেড়াতে এলাম ? ডাক্তার প্রশ্ন করলেন।

—তা প্রায় বছর কুড়ি তো হবেই। হোটেলের মালিক সঞ্জয় সেন বললেন।

—নাঃ, আপনার মনে নেই দেখছি। আমি এখানে এসেছিলাম আজ থেকে ঠিক বছর পঁচিশেক আগে। জায়গাটা হঠাৎ ভাল লেগে গিয়েছিল, তাই মাসখানেক আপনার এই হোটেলে কাটিয়ে গিয়েছিলাম।

—হ্যাঁ···হ্যাঁ, এবার ঠিক মনে পড়েছে। সঞ্জয় সেন হাসতে হাসতে বললেন।

দোতলা ছোট হোটেল। দোতলার পশ্চিমের একটা সুন্দর ঘর আমাদের থাকার জন্য নির্দিষ্ট হল। হোটেলে বসে থেকেই কয়েকটা দিন কেটে গেল। বৃথা সময় নষ্ট করার জন্য ডাক্তারের ওপর মনে মনে বিরক্ত হলেও মুখে কিছু প্রকাশ করলাম না। খামখেয়ালী মানুষ, কখন কি করে বসেন তার ঠিক-ঠিকানা নেই। কাজেই ডাক্তারকে কোন কথা বলে বিরক্ত করা যুক্তিসঙ্গত মনে করলাম না। এক এক করে দিন কেটে যেতে থাকে। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলায় ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে ডাক্তার বললেন—একটা গল্প বলব আজ ! বিশ্বাস করবেন কি ?

—না করার কি আছে ? তারপর আপনি যখন ঐ গল্প বলছেন তখন বিশ্বাস না করার মত তো কিছু দেখছি না।

—তাহলে শুনুন।

এই বলে ডাক্তার আস্তে আস্তে বলে চললেন—আমি সেবার পূজোর কিছু দিন আগে গিরিডিতে হঠাৎ একদিন বেড়াতে এলাম। ছোট-খাটো শহর। যান-বাহনের কোন ভিড় নেই। কোলকাতার মত পথে পথচারীদেরও মিছিল নেই। বেশ শান্তি আর নিরিবিলিতে দিন কাটাচ্ছিলাম। হঠাৎ একদিন নীচে নামার সময় দেখলাম, সঞ্জয়বাবু একটি বছর কুড়ি বয়সের ছেলেকে বলছেন—বলছি তো এখানে কোন কাজ নেই। বারবার আমাকে বিরক্ত করতে আসিস কেন ?

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম ব্যাপার দেখে। তারপর সোজাসুজি সঞ্জয়বাবুকে প্রশ্ন করলাম—

ছেলেটিকে বকাবকি করছেন কেন? কাজ ওর একটা জুটলেও জুটতে পারে।

—না মশাই, চাকরি কি আর হাতের মোয়া যে হুট করতেই জুটে যাবে!

—হ্যাঁ মশাই, হ্যাঁ। আমার ছোট-খাটো ফাই-ফরমাস খাটার জন্যে ওকে রেখে দিন। আপনার কোন ভয়ের কারণ নেই। ওর মাস মাইনেটা আমিই দেব।

সেই থেকে দেবু আমার কাজে বহাল হয়ে গেল।

সুন্দর একহারা গড়ন। গায়ের রং মিশ কালো। মাথা ভর্তি কালো কুচকুচে চুল। আদুর গা। পরনে তালিমারা কালো রঙের একটা হাফ প্যাণ্ট। ভারি মিষ্টি স্বভাব। সর্বদা মুখে হাসি লেগে রয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে ও আমার খুব ঘনিষ্ট হয়ে উঠল। হাসতে হাসতে একদিন দেবুকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম—আচ্ছা দেবু, তোর বাড়ি কোথায় রে?

—ঐ হোথায়। বলে জানলা দিয়ে দূর পাহাড়ের দিকে আঙুল তুলে দেখাল।

—আমায় একদিন নিয়ে যাবি তোদের বাড়িতে? আমি বললাম।

—কেনে নিয়ে যাব না? তবে ঘরে বাবা বাদে আর কেউ নেই। মা ছোটু বেলায় মারা গেছে। আমি বাবার এক ছেলে।

দেবুর মা নেই শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। মায়ের স্নেহ যে কি জিনিস ও তা জানে না! দেবুর পিঠে হাত বুলিয়ে আবার বললাম—তোর বাবা কি করে?

—সাপ ধরে।

এমনি করে অল্প অল্প করে দেবুদের অনেক কথাই জেনে ফেললাম। সেই থেকে ওর সঙ্গে আমার খুব ভাব। একদিন ভোরবেলায় দেবুর সঙ্গে গেলাম ওদের গ্রামে। ছোট্ট গ্রাম। মাত্র কয়েকঘর দরিদ্র মানুষের বাস। ঘরগুলো সবই প্রায় মাটির। দেওয়ালগুলো গেরুয়া রঙের মাটি দিয়ে ভারি সুন্দরভাবে নিকোনো। বাড়িতে তখন দেবুর বাবা ছিল না সাপ ধরতে বেরিয়েছিল। কাজেই, একরকম বাধ্য হয়েই তখন ঊশ্রীর দিকে রওনা হলাম।

ঊশ্রী নদী বইতে বইতে এসে হঠাৎ একটা পাহাড়ের উপর উঠে সশব্দে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। চারদিক জলকণায় ঝাপসা। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে জলপ্রপাতের অপরূপ দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে রইলাম। চোখ ফেরাতে পারলাম না। তারপর একসময় নদীটাকে পাশে রেখে পাহাড়ে উঠতে শুরু করলাম। অনেক কষ্টে অবশেষে পাহাড়ের চূড়ায় উঠলাম। উঠে দেখলাম মাথায় গেরুয়া রঙের পাগড়ি বাঁধা একজন লোক একটা মস্ত কালো পাথরের আড়ালে উবু হয়ে বসে অতি সন্তর্পণে কী যেন করছে! লোকটাকে দেখতে পেয়ে দেবু ওর মুখটা আমার কানের কাছে এনে ফিসফিস করে বলল—বাবা!

আমাদের সাড়া পেয়ে লোকটাও ততক্ষণে পিছন ফিরে তাকালো। অতি সাদাসিধে ধরনের গ্রাম্য মানুষ। কিন্তু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আরো যেন কিছু দেখতে পেলাম। আমি দেখতে পেলাম, এক বিষধর সাপ ওর হাতে ছোবল মারতে উদ্যত। মৃত্যুবাণ ওর জন্য প্রস্তুত। মনটা আপনা থেকেই খারাপ হয়ে গেল। এ কী দেখলাম? শুরু হল আমার অদ্ভুত অন্তর্নিহিত শক্তির ক্রমবিকাশ! অবশ্য এ ব্যাপার আর কাউকে জানাইনি—জানানো প্রয়োজন মনে করি নি।

যাই হোক, ধীরে ধীরে একসময় আমরা নিঃশব্দে দেবুর বাবার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। দাঁড়ানো মাত্র একটা ক্রুদ্ধ হিসহিস শব্দ কানে এল। আতঙ্কে কয়েক পা পেছিয়ে এলাম। নাগরাজকে বিশ্বাস করা যায় না! এখনই হয়তো আমাদের ওপর

ঝাঁপিয়ে পড়বে কৃতান্তের মত। কিন্তু আমরা সভয়ে দেখলাম, দেবুর বৃদ্ধ পিতা মা মনসাকে স্মরণ করে ওর হাতটা পাথরের একটা ফাটলে ঢুকিয়ে দিল। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। সাপের মাথাটা বোধ হয় ঠিক মত হাতের মুঠোয় ধরতে পারেনি। একটা যন্ত্রণা-কাতর শব্দ করে ও হাতটা আবার টেনে বার করে নিল। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠতে সর্প-দংশনের চিহ্ন সুস্পষ্ট। তাজা রক্ত ঝরে পড়তে থাকে ওর আঙ্গুল বেয়ে।

ছুটে গেলাম বৃদ্ধের কাছে। একটা বুনো লতা দিয়ে ওর হাতটা বেঁধে দেব বলে হাতটা টেনে ধরতেই বৃদ্ধ বলল—কোন ভয় নেই। আমরা সাপুড়ে। মন্ত্রগুণে সব এখনই ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু মন্ত্র-টন্ত্র ওর কোন কাজে লাগল না। দেবুর বৃদ্ধ পিতা চোখের সামনে ধীরে ধীরে হিম-শীতল মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। সাক্ষী হয়ে রইলাম আমি আর দেবু!

ডাক্তার অনিমেশ চ্যাটার্জী এক সঙ্গে অত-গুলো কথা বলে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। তিনি চুপ করলেন। তারপর পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখটা ভাল করে মুছে নিয়ে বললেন—আজ ঐ উশ্রীতে বেড়াতে যাবো। আর আপনাকে দেখিয়ে আনবো সেই অকুস্থল। দেবু আজ কোথায় আছে জানি না। কিন্তু ওর বাবার মৃত্যুর পর থেকে আর কেউ কোথাও ওকে দেখতে পায় নি!

বিকেল বেলায় আমরা দুজনে রওনা হলাম উশ্রীর দিকে। সুন্দর নির্জন জায়গা। শহরের কোলাহল থেকে দূরে এমন নিভৃত স্থানেও যে একদিন মৃত্যু এসে হানা দিয়েছিল, ডাক্তার না বললে হয়তো কোন দিনও জানতে পারতাম না।

উশ্রীর জলপ্রপাত দেখা হলে পর ডাক্তার বললেন—চলুন, উপর থেকে ঘুরে আসি একবার। দুজনে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে সাবধানে পা

দেবু ফিসফিস করে বলল—বাবা! [পৃষ্ঠা ৮৮

রেখে পাহাড়ে উঠছি, হঠাৎ ডাক্তার তীব্র চিৎকার করে উঠলেন—আর উঠবেন না। এখনি একটা কেউটে আপনার দিকে নেমে আসবে। শীগগির সরে আসুন এদিকে।

ডাক্তারের সাবধান বাণী শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র বেগে হিসহিস শব্দে একটা বিষধর কেউটে একেবারে আমার পাশ ঘেঁষে নীচের দিকে নেমে গেল।

সাপটা চলে যেতে বুকখালি একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। বরাত জোরে আজও বেঁচে গেছি! ভাগ্যিস ডাক্তার ছিলেন কাছে! এরপর গিরিডি থেকে একদিন আমরা দুজনে ফিরে এলাম, কিন্তু ডাক্তারের উদ্ভট অসুখের কোন সুরাহা হয়নি।

ডাঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য

এক রাজবাড়ির সুমুখে প্রশস্ত ময়দানে ডুগডুগি বাজিয়ে এক জাদুকর খেলা দেখাচ্ছে। জাদুকরের চারিদিকে লোক ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। মাঝখানে চাদর চাপা একটা কি দাঁড় করানো রয়েছে। জাদুকর একটা ছড়ি নিয়ে কি দাগ কাটছে, আর বলছে—'আগা হায় ময়ুত সে কৈ বসর নেহি, সমান শ' বরষকি পল কি খবর নেহি।' সেই চাদর ঢাকাটা অল্প একটু খুলেই চাপা দিচ্ছে, আর বলছে 'সবুর বেটা, সবুর'।

অনেক লোক জড়ো হতেই জাদুকর চাদরটা খুলে দিল। দেখা গেল একটা কাঠের ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে।

জাদুকর বলছে—'এটা আমার পক্ষিরাজ ঘোড়া। বড্ড গরম। ঘোড়ার জল তেষ্টা পেয়েছে। একে জল এনে দাও, খাবে।'

সকলে আশ্চর্য হয়ে গেল। কাঠের ঘোড়া জল খাবে?

পাড়ার ছেলেমেয়েরা দৌড়ে দৌড়ে যে যার বাড়িতে ছুটে গেল। বালতি করে সব জল আনছে। ছেলেমেয়েরা জলের বালতি ঘোড়ার মুখের কাছে রাখল, কিন্তু ঘোড়া খেল না।

ছেলেমেয়েরা বলছে—'কই জাদুকর! তোমার ঘোড়া কই জল খাচ্ছে? কেবল মিছে কথা বলছ? আমরা এত কষ্ট করে জল নিয়ে এলুম?'

তখন জাদুকর বলছে—'কাঠের ঘোড়া, কাঠের ঘোড়া, জল পী-পী-পী। দাদাবাবু এনেছে, দিদিমণি এনেছে, জল পী-পী-পী ঘোড়া।'

তখন ঘোড়া সত্যিই বালতিতে মুখ ডুবিয়ে জল খেল।

রাজা এই কথা শুনতে পেয়ে জাদুকরকে রাজ-দরবারে ডেকে পাঠালেন। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কাঠের ঘোড়া জল খায়?'

জাদুকর বলল, 'হ্যাঁ হুঁজুর। শুধু জল খাওয়া

নয়, এ ঘোড়ার অনেক গুণ। হুজুর এটা আপনি কিনে নিন।'

রাজা বললেন—'এমন কি গুণ আছে তোমার ঘোড়ার যে আমায় টাকা দিয়ে কিনে নিতে হবে?'

জাদুকর বলল, 'হুঁজুর, এই পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চেপে আপনি সারা ভুবন ইচ্ছামত ঘুরে আসুন, কোন খরচ নেই, কোন ঝঞ্ঝাট নেই।'

রাজা বললেন—'কি রকম?'

জাদুকর বলল, 'তাহলে দেখুন জাঁহাপনা, এর কেরামতি।' এই বলে জাদুকর ঘোড়ায় চেপে বসল। পিঠের কাছে একটা হ্যাণ্ডেল ছিল, সেটা ঘোরাতেই ঘোড়া জাদুকরকে পিঠে নিয়ে ওপরে উড়ে গেল। খানিকক্ষণ হাওয়ায় এদিক ওদিক ঘুরে পুনরায় রাজদরবারে এসে নামল। সকলে অবাক্ হয়ে চেয়ে রইল। বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার!

রাজা বললেন—'তুমি ঘোড়ার কত দাম চাও?'

জাদুকর বললো, 'জনাব! টাকা দিয়ে এ ঘোড়ার দাম ধার্য হবে না। এ ঘোড়ার দাম রাজকন্যা। রাজকন্যার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে হবে।'

সভার সকল লোক হো হো করে হেসে উঠল।

জাদুকর বলল—'আপনারা হাসলেন কেন?'

সকলে জবাব দিল—'তোমার আস্পর্ধা তো কম নয়? বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে চাও? একটা সামান্য জাদুকর হয়ে রাজকন্যাকে বিয়ে করতে চাও?'

রাজা একটু নিমরাজী হলেন। কারণ ঘোড়াটার ওপর তাঁর যথেষ্ট লোভ হয়েছে। কিন্তু যুবরাজ ও রাজা দুই বাপ-বেটায় কথা কাটাকাটি হতে লাগল। জাদুকর বুঝতে পারল, রাজা রাজী আছেন, কিন্তু যুবরাজের আপত্তি আছে।

জাদুকর যুবরাজকে গিয়ে বলল—'হুজুর, আপনি নিজে পরীক্ষা করে দেখুন এর গুণ কত।'

যুবরাজ ঘোড়ায় চড়ে বসলেন এবং ঘোড়ার পিঠের ওপর হ্যাণ্ডেলটা ঘুরিয়ে দিতেই যুবরাজকে নিয়ে ঘোড়া শূন্যে উড়ে গেল। অনেক ওপরে উঠে গেল। রাজপুত্রকে ছোট্টমত দেখাচ্ছে, শেষে একেবারে একটা ছোট বিন্দুর মত দেখাচ্ছে। পরিশেষে তা-ও দেখা গেল না। একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রাজা বললেন—'এ কি জাদুকর! আমার ছেলে কোথায় গেল?'

জাদুকর বললে—'জাঁহাপনা! আমার কি দোষ? যুবরাজ আমার কাছ থেকে ভাল করে জেনে নিলেন না, কোন্ হ্যাণ্ডেল ঘোরালে ওপরে উড়বে, কোন্ হ্যাণ্ডেল ঘোরালে নীচে নামবে!'

রাজা বললেন—'জানলেই বা কি হোত? যদি সমুদ্রে নামে, পাহাড় জঙ্গলে নামে? যত নষ্টের গোড়া তুমি। তোমার ঘোড়া আসতেই তো আমি ছেলেকে হারালুম? তোমাকে জেলে বন্দী করে রাখব। তিন মাসের মধ্যে যদি আমার ছেলে ফিরে না আসে, তোমাকে ফাঁসি দেওয়া হবে।'

যুবরাজ শূন্যে চলে গেল, জাদুকর জেলে চলে গেল।

এদিকে রাজপুত্র পক্ষিরাজে চড়ে শূন্যে আরও শূন্যে উড়ে চলেছে। ভয়ে বুক কেঁপে উঠছে—কোথায় নিয়ে যাবে রে বাবা? চন্দ্রলোক? মঙ্গল-গ্রহ? শুক্রগ্রহ? নীচে নদ-নদী-গিরি-বন-উপবন যা-ও-বা নজরে আসছিল আর তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না! কী সর্বনাশ! এখন উপায়? ঘোড়ার গলার কাছে আরও দুই একটা হ্যাণ্ডেল ছিল। নাড়-চাড়া করতে একটা হ্যাণ্ডেল ঘুরে গেল। অমনি ঘোড়া উত্তরমুখো উড়ে যেতে লাগল। বাঁ দিকে ঘাড়ের কাছে একটা হ্যাণ্ডেল ছিল, সেটা ঘোরাতেই ঘোড়া আস্তে আস্তে নীচে নামতে লাগল। ক্রমশঃ নদ-নদী, বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত দেখা যেতে লাগল। ভয় হচ্ছে, যদি গঙ্গার মাঝখানে নামে?

ভয়ে সর্বশরীর কাঁপতে লাগল। আস্তে আস্তে ঘোড়া একজনের বাড়ির ছাদে নামল। বাঁচা গেল! কিন্তু এত বড় ছাদ কার বাড়ির? চারিদিক ঘুরেফিরে বুঝতে পারল—এটা এখানকার রাজার প্রাসাদ। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গিয়ে দেখতে পেল, এটা ঘুমন্ত পুরী। দিনের বেলাতেই সকলেই ঘুমিয়ে আছে। ঝি-চাকর-দারোয়ান সবাই ঘুমিয়ে আছে। একটা ঘরে দেখল একটা অপরূপ সুন্দরী মেয়ে সোনার পালঙ্কের ওপর শুয়ে ঘুমোচ্ছে। যুবরাজ তার গায়ে হাত দিয়ে ডাকতেই সে জেগে উঠল। বলল—'কে তুমি? কোথা থেকে এলে? আমার মহলে তুমি প্রবেশ করলে কিরূপে? চারিদিকে সশস্ত্র প্রহরী, কেল্লার ভেতর এ প্রাসাদ, তুমি ঢুকলে কি করে?'

যুবরাজ বললে—'আমি কাঠের পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়ে তোমাদের ছাদে নেমেছি। আমি খুবই ক্ষুধার্ত, আমায় কিছু খেতে দাও।'

সুপুরুষ রাজপুত্রকে দেখে রাজকন্যার মায়া হল। সে দাসীদের ডেকে তার খাবার আয়োজন করে দিতে বলল এবং নিজের মহলেই একখানা ঘরে তাকে থাকতে দিল। এসব কথা ভয়ে রাজাকে জানাল না। পাছে রাজা রাগ করে যুবরাজকে কেটে ফেলেন।

কিছুদিন এই ভাবে থাকতে থাকতে যুবরাজ ও রাজকন্যার খুব ভাব হয়। একদিন যুবরাজ রাজকন্যাকে বিয়ে করবার প্রস্তাব করল। রাজকন্যাও রাজী হয়ে গেল। কিন্তু চিন্তা হল, যদি রাজা রাজী না হন? তখন দুজনে পরামর্শ করে ঠিক করল, ঐ পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চেপে দুজনে উড়ে চলে যাবে যুবরাজের দেশে। সেখান থেকে দূত পাঠিয়ে রাজাকে সব কথা খুলে লেখা হবে। তখন রাজা মত না দিয়ে পারবেন না। এই পরামর্শই পাকা হল।

একদিন প্রত্যূষে কারোকেও কিছু না বলে রাজকন্যা রাজপুত্রের সঙ্গে পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চেপে উড়ে গেল। রাজপুত্র সরাসরি রাজার কাছে না নিয়ে গিয়ে নিজেদের বাগানবাড়িতে রাজকন্যাকে রেখে গেল। ভাবল, রাজাকে গিয়ে সব খোলাখুলি বলবে এবং অনুনয় বিনয় করবে, তিনি যেন রাজকন্যাকে পুত্রবধূরূপে বরণ করে ঘরে নিয়ে আসেন।

রাজপুত্র যেই রাজবাড়িতে পৌঁচেছে, সকলের কী আনন্দ! সকলেই তার আশা ত্যাগ করেছিল। রাজা রানী তো রোজই কাঁদেন, তাঁদের চোখের জল শুকোয় না। প্রজারাও রাজপুত্রকে দেখে খুব খুশী। রাজা সেই জাদুকরকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে বললেন—'তোমার ঐ ধূমকেতু ঘোড়া নিয়ে সরে পড়। ঐ অলক্ষুণে ঘোড়া আর এক মুহূর্তও এ রাজধানীতে রাখতে চাই না।'

জাদুকর মাথা নীচু করে ঘোড়াটি নিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। সকলে ভাবল বালাই গেল। তখন জাদুকরের নিঃশব্দে পলায়ন দেখে কেউ বুঝতেই পারল না—ওর ভেতর ভেতর শয়তানী বুদ্ধি খেলছে।

রাজা যুবরাজের নিকট তার শূন্যমার্গের বিচিত্র কাহিনী শুনছেন। অবশেষে রাজকন্যাদের ছাদে অবতরণ এবং রাজকন্যার পাণিগ্রহণে প্রতিশ্রুতি—

ঠিক এই সময়ে ঐ জাদুকর বাগানবাড়িতে গিয়ে রাজকন্যাকে বলল, 'রাজপুত্র আমায় পাঠিয়েছেন আপনাকে ঘোড়ায় করে রাজদরবারে নিয়ে যেতে। রাজা আপনাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন।'

সরলমতি রাজকন্যা তার হীন অভিসন্ধি বুঝতে না পেরে তার সঙ্গে ঘোড়ায় চেপে বসল। জাদুকর তাকে নিয়ে সোজা আকাশে উড়ে গেল। এদিকে রাজপুত্রের মুখে সব শুনে রাজা যুবরাজকে সঙ্গে নিয়ে সেই বাগানবাড়িতে আসছিলেন.

রাজকন্যাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। ওমা! তাঁদের চোখের সামনে দিয়েই রাজকন্যাকে নিয়ে জাদুকর ফুড়ুৎ পার। পাখি উড়ে গেল।

রাজা রাগে তরবারি খুলে শূন্যে বৃথাই আস্ফালন করতে লাগলেন। সে তখন তাঁদের নাগালের অনেক ঊর্ধ্বে। যুবরাজ দুঃখে, অপমানে মাটির সঙ্গে মিশে গেল। যাকে এত কষ্ট করে তার বাপের কাছ থেকে লুকিয়ে এখানে নিয়ে এল, সে কি না একটা সামান্য জাদুকরের হাতে চলে গেল? রাজপুত্র মনের দুঃখে খাওয়া দাওয়া ত্যাগ করল। কেবল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আর আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। খোঁজে কাকে মেঘে মেঘে। হায় যুবরাজ! তোমার বোকামির জন্য এই কাণ্ড হল। অতদূর থেকে উড়ে এলে, শেষকালে নিজের বাগানবাড়িতে এসে হোঁচট খেলে? কেন সরাসরি বাড়ি নিয়ে গেলে না? আর এখন ভেবে লাভ নেই। হাহুতাশ করেও ফল হবে না। যে স্বর্গে যায় সে কি ফেরে?

যুবরাজ ভেবে ভেবে শীর্ণকায় হয়ে গেল। কারও সঙ্গে কথা বলে না। একদিন চুপিচুপি সাধুর বেশ ধরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। প্রতিজ্ঞা করল, যদি তাকে খুঁজে পাই, তবেই ফিরব।

এদিকে ঐ জাদুকরটা রাজকন্যাকে নিয়ে এক দেশের জঙ্গলে নেমেছে। সে বলছে—'আমি তোমায় বিয়ে করব।'

রাজকন্যা রাজী হচ্ছে না। কান্নাকাটি করছে, হাতে পায়ে ধরছে। বলছে—'তোমার পায়ে পড়ি জাদুকর, আমাকে যেখান থেকে এনেছ, সেখানে রেখে এস। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি, তোমায় প্রচুর পুরস্কার দেব। তুমি সারাজীবন বসে খাবে।'

জাদুকর সে কথা কানেই শোনে না। একজন কিন্তু এ কথা শুনতে পেলেন। তিনি সেই দেশের রাজা। তিনি জঙ্গলে এসেছিলেন শিকার

রাজকন্যা রাজার পায়ের ওপর আছড়ে পড়ল।

করতে। আড়াল থেকে একজন পুরুষের জুলুম ও একটি নারীর অনুনয় বিনয়, কান্না তাঁর কানে গেল। তিনি সেখানে উপস্থিত হতেই রাজকন্যা তাঁর পায়ে আছড়ে পড়ল—'আমার সম্ভ্রম, মর্যাদা আপনি রক্ষা করুন।'

রাজা প্রশ্ন করলেন—'কে তুমি? এ লোকটাই বা কে? তোমরা এখানে কি করে এবং কেন এলে?'

রাজকন্যা নিজের পরিচয় দিয়ে সব কথা রাজাকে জানালেন। রাজা রেগে গেলেন। খাপ থেকে তরোয়াল বার করে এক কোপেই জাদুকরকে দু' টুকরো করে দিলেন।

কিন্তু রাজকন্যার কপালক্রমে সে সমস্যার সমাধান হল না। রাজা রাজকন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করতে চাইলেন। রাজকন্যা আবার

সমস্যার জালে জড়িয়ে পড়ল। মনে মনে বলল, হায় ভগবান! সরষের মধ্যেই যদি ভূত ঢুকল, তো ঝাড়ব কি দিয়ে? উনি দেশের রাজা। যিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করে থাকেন, তাঁর অন্যায়ের বিরুদ্ধে কার কাছে নালিশ করব?

রাজকন্যা রাজার পায়ে ধরেও অনেক কাকুতি মিনতি করল। রাজা সে কথায় কর্ণপাত না করে সেই ঘোড়ায় চড়ে নিজের প্রাসাদে নিয়ে গেলেন। রাজকন্যা বিয়েতে সম্মতি না দেওয়ায় বন্দীশালায় রেখে দিলেন। রাজকন্যা কোন উপায় না দেখে ইচ্ছে করে পাগল সাজল। হাসে, কাঁদে, লোক দেখলে দৌড়ে কামড়াতে যায়। রাজা রাজ্যের চিকিৎসক, হাকিম, বৈদ্য, ওজা, গুণী এনে জড়ো করলেন। কিছুতেই কিছু হল না। হবে কি করে? সত্যি সত্যি রোগ হলে তবে তো তা চিকিৎসায় সারবে! এ তো নকল পাগল সেজেছে। রাজা সমস্ত রাজ্যে ঢ্যাঁড়রা পিটিয়ে দিলেন, যে রাজকন্যাকে ভাল করে দেবে, প্রচুর পুরস্কার পাবে।

এদিকে সন্ন্যাসীবেশী যুবরাজ রাজকন্যার খোঁজে বেরিয়ে এদেশ সেদেশ ঘুরতে ঘুরতে এই দেশে এসে পৌঁছোল! শুনতে পেল, এ দেশের রাজা কোন এক দেশ থেকে রাজকন্যাকে ধরে এনেছেন এবং তাকে বিয়ে করতে চান। কিন্তু রাজকন্যা বিয়ে করতে ইচ্ছুক নয়। রাজা জোর করাতে রাজকন্যা পাগল হয়ে গেছে। তাকে যে ভাল করে দেবে প্রচুর পুরস্কার পাবে।

এই শুনে সন্ন্যাসীবেশী যুবরাজের সন্দেহ হল—আমার সেই রাজকন্যা নয় তো? রাজার কাছে এসে বলল, 'মহারাজ! আমি ঐ রাজকন্যাকে ভাল করে দেব।'

রাজা রাজকন্যার নিকট পাঠিয়ে দিলেন। যুবরাজ দেখেই চিনতে পারল। কিন্তু রাজকন্যা চিনতে পারল না—দৌড়ে যুবরাজকে মারতে এল। কারণ যুবরাজের এত বড় বড় দাড়ি গোঁফ গজিয়ে উঠেছে, চেনা যায় না।

যুবরাজ চুপি চুপি বলল—'এই! ভাল করে দেখ—আমি—আমি যুবরাজ। তোমারই খোঁজে সন্ন্যাসীবেশে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি।'

তখন রাজকন্যা ভাল করে দেখে চিনতে পারল।

রাজকন্যা বলল—'শীগ্‌গির আমায় নিয়ে পালিয়ে চল। এখানে আর একদিনও থাকলে আমি বাঁচব না।'

যুবরাজ বলল—'সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমাকে যা করতে বলি তাই কর। তুমি ভাল হয়ে যাও। আমি রাজাকে ডেকে দেখাই। রাজা খুশী হয়ে তোমায় বন্দীশাল থেকে নিয়ে যাবেন। তারপর দুদিন বাদে তুমি ফের পাগল হয়ে যেও। রাজা আমায় আবার ডাকতে পাঠাবেন। তার পরে যা ব্যবস্থা হয় আমি করব

এই পরামর্শ মত যুবরাজ রাজাকে এসে বলল,—'মহারাজ! রাজকন্যা ভাল হয়ে গেছে।'

রাজা এসে দেখলেন রাজকন্যা ভালভাবে কথাবার্তা বলছে। খুব খুশী হলেন। তারপর বললেন—'সাধুবাবা! আপনি আর এক সপ্তাহ আমার অতিথিভবনে থাকুন। তারপর আপনাকে প্রচুর পুরস্কার দিয়ে বিদায় দেব।'

সন্ন্যাসী অতিথিভবনে থাকলেন। এদিকে রাজকন্যা যুবরাজের পরামর্শমত দুদিন বাদে পুনরায় পাগল হল। রাজা আবার সন্ন্যাসীকে ডাকলেন। এবার যুবরাজ ভাল করে রাজকন্যার পাগলামী লক্ষ্য করে বলল—'মহারাজ! যত অনিষ্টের মূল ঐ কাঠের ঘোড়া। উহার শোধন করা প্রয়োজন। রাজকন্যাকে আপনার বাগান-বাড়িতে রেখে দিন। তাঁর ঘরের সামনে অশ্বত্থ

করব। সেই যজ্ঞের চরু খেলেই আর পাগল হবেন না। তবে যজ্ঞের সামনের পিঁড়িতে উনি একা থাকবেন।'

রাজা সম্মত হলেন। তা ছাড়া উপায় কি? একবার ভাল হয়ে যাওয়াতে সন্ন্যাসীর ওপর রাজার অগাধ বিশ্বাস জন্মেছে। ফল, ফুল, ধূপ, ধূনো, বেলপাতা, বেলকাঠ, বালি, ঘি ইত্যাদির প্রচুর আয়োজন হল। রোজ সন্ধ্যাবেলা রাজা নিজে এসে যজ্ঞ দেখে যান। এইভাবে দু' তিন দিন কাটবার পর একদিন প্রত্যূষে যখন রাজ্যের সকল লোক ঘুমিয়ে আছে যুবরাজ রাজকন্যাকে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে পালিয়ে গেল। একেবারে নিজের রাজ্যে নিয়ে এসে নামল। সারা রাজ্যে আনন্দের স্রোত বয়ে গেল। খুব ধুমধামের সঙ্গে যুবরাজ ও রাজকন্যার বিয়ে হয়ে গেল।

এদিকে রাজা যথারীতি সন্ধ্যাবেলা অশ্বযজ্ঞ দেখতে এলেন। এসে ছাখেন সব ভোঁ—ভাঁ। অশ্বও নেই, যজ্ঞও নেই। রাজা চিৎকার করে ডাকলেন — 'সন্ন্যাসী — সন্ন্যাসী — রাজকন্যা — রাজকন্যা—সন্ন্যাসী ভাই!'

প্রতিধ্বনি ওঠে—নাই—নাই—! পাখি উড়ে গেছে।

আর্কিমিডিস

প্রাচীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ ও বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের জন্ম হয় খ্রীষ্টপূর্ব ২৮৭ সালে, ইতালির অন্তঃপাতী সিরাকিউজ নগরে। জাত্যংশে তিনি গ্রীক। তাঁর পিতা ফিডিয়াসও বিজ্ঞানী হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন।

বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আবিষ্কার করে পৃথিবীজোড়া খ্যাতি অর্জন করলেও আর্কিমিডিসের সমধিক কৃতিত্ব ছিল গণিতের বিভিন্ন শাখায়। কত গল্পই যে তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত আছে আজও। এক সময়ে তিনি বলেছিলেন পৃথিবীর বাইরে একটু দাঁড়াবার জায়গা যদি পাই, তা হলে পৃথিবীটাকে আমি ইচ্ছামত ঘোরাতে পারি। সিরাকিউজের রাজা হিয়েরন সেকথায় বিশ্বাস করতে চান না দেখে রাজাকে তিনি এমন একটা যন্ত্র তৈরি করে দিলেন, যার সাহায্যে রাজা একাই একটা বোঝাই জাহাজকে নাড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। স্মরণ রাখতে হবে সেটা বাষ্পায় যানের যুগ নয়।

রোমক নৌবাহিনী সিরাকিউজ আক্রমণ করল যখন, নগরের ভিতর এমন কায়দায় বড় বড় আয়না বসিয়ে দিলেন আর্কিমিডিস যে সেই আয়নায় প্রতিফলিত সূর্যকিরণ আগুনের আকারে গিয়ে পড়ল রোমক জাহাজগুলির উপরে, তারা পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

খ্রীষ্টপূর্ব ২১২ সালে আর্কিমিডিসের মৃত্যু হয়। রোমক সৈন্যদল যখন অধিকার করল সিরাকিউজ, নাগরিকেরা পালিয়ে গেল প্রাণভয়ে। কিন্তু আর্কিমিডিস তখন গবেষণায় মগ্ন, তিনি শত্রুসৈন্যের আগমনের কোন খবরই রাখেন নি। সেই সাধনার আসনেই তাঁকে হত্যা করল রোমক সৈন্যরা।

রাজর্ষি লেভেলি

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

ফ্রান্সের রাজা মারা গিয়েছেন। খবর পৌঁছোলো ব্রিটেনে।

অপুত্রক ছিলেন ঐ রাজা, সন্তান বলতে একটি কন্যাই রেখে গিয়েছেন। সেই কন্যাই পাবে ফরাসীদেশের রাজপাট। নাম তার হেনরিয়েটা।

একে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিতা, তায় আবার সর্ববিদ্যায় বিদুষী। স্বর্গীয় রাজা তাকে নিজে দীর্ঘ-দিন ধরে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন রাজনীতি, ধর্মনীতি এবং সকল রকম ব্যবহারিক বিদ্যার প্রয়োগনীতি।

তা ছাড়া পরমাসুন্দরীও এই হেনরিয়েটা। স্বভাবতঃই ইউরোপের সব দেশের রাজপুত্রেরা চঞ্চল হয়ে উঠল। কথায় বলে 'অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা'। এ ত তার চেয়েও বেশী। একেবারে পুরো রাজত্ব আর রাজরানী। হেনরিয়েটা যাকে পতিত্বে বরণ করবে, সে ত রাতারাতি দেবরাজ জুপিটার বনে যাবে!

নানা দেশ থেকে সম্বন্ধ আসতে শুরু হয়েছে। কোন দেশের রাজপুত্র, কোন দেশের রাজভ্রাতা হেনরিয়েটার পাণিপ্রার্থী। অনেক প্রার্থী আবার দূত পাঠিয়ে ক্ষান্ত থাকতে পারেননি, সশরীরে এসে হাজির হয়েছেন দুই চারশো সৈনিক সহচর সঙ্গে নিয়ে। উদ্দেশ্য, সাক্ষাতে সমুখে হেনরিয়েটাকে নিজের যোগ্যতার আনুপূর্বিক বিবরণ শোনানো।

কিন্তু কঠিন ঠাঁই এ। নিজে হেনরিয়েটা ক্ষুরধার বুদ্ধির অধিকারিণী, তার উপরে পিতার আমলের বিশ্বস্ত অনুরক্ত সচিব সেনাপতিরা সারাক্ষণ দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করে রেখেছেন তাঁদের রানীকে ঘিরে। কতক প্রার্থীকে ফিরে যেতে হয় ঐ ব্যূহভেদ করতেই অক্ষম হয়ে। যাঁরা ও বাধা অতিক্রম করে রানীর কাছে পৌঁছোতেও পারেন, তাঁদেরও এ-যাবৎ হতাশ হয়েই ফিরতে হয়েছে। দু'টি একটি ছোটখাটো আলোচনার পরেই হেনরিয়েটা তাঁদের বিদায় দিয়েছেন "বিশ্রাম করুন গিয়ে, পরে দেখা হবে আবার"—এই কথা বলে। কিন্তু হায়, সে দেখা আর হয়নি। আবেদন নিবেদন করেও তাঁরা একান্ত সচিব ছাড়া আর কারও দেখা পাননি কোনদিন। দেশে ফিরতে হয়েছে অবশেষে।

খবর পৌঁছোলো ব্রিটেনে। এই সব খবরই।

এখন ব্রিটেনের রাজা হলেন রাজা লাড। পিতা ছিলেন রাজা বেলি, দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। সমগ্র ব্রিটেনকে তিনিই সর্বপ্রথম একচ্ছত্র শাসনে আনয়ন করতে পেরেছিলেন। তাঁর ছিল তিন পুত্র। লাড, কাসলাওয়ান আর নিনুও। লাডই জ্যেষ্ঠ, এবং সব দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠও বটে। সিংহাসনে তিনিই বসলেন। নিজের দেশের সীমার বাইরেও অনেক দেশে প্রভুত্ব বিস্তার করলেন। সবচেয়ে বড় কথা, তিনিই নতুন রাজধানী গঠন করে তার নাম রাখলেন লাডন, নিজের নামানুসারে। কালক্রমে সেই নামই ঈষৎ পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়াল লণ্ডন-এ।

এখন রাজা লাডের কাছে একে একে এলেন তাঁর দুটি ভাই-ই, কাসলাওয়ান আর নিনুও। প্রত্যেকেরই বাসনা, ফরাসী রানীর পাণিপ্রার্থী হয়ে একবার সে-দেশে যান। "স্বচ্ছন্দে যেতে পার, খরচ খরচা যা দরকার, রাজকোষ থেকেই পাবে"—বললেন রাজা লাড। মনে মনে তিনি বিলক্ষণ জানেন, দুটি ভাই-ই তাঁর অতি সাধারণ স্তরের

লোক, রানী হেনরিয়েটার কাছে ঘেঁষবারই সামর্থ্য তাদের হবে না। কিন্তু প্রথম থেকেই তাদের নিরুৎসাহ করে দেওয়া যায় যদি, সেটা দৃষ্টিকটু হতে পারে। কতক লোক অন্ততঃ বলবে, রাজা লাড ভাইদের উন্নতি কামনা করেন না, তারা তাঁর সমকক্ষ হয়ে উঠুক, এটা মনোগত ইচ্ছা নয় তাঁর।

কাজেই যাক ওরা। কিছু অর্থ অপব্যয় হবে অবশ্য। তা কী আর করা যাবে? ওরাও ত রাজা বেলিরই পুত্র! রাজকোষের কিছু অর্থ নষ্ট করার অধিকার ওদের অবশ্যই আছে।

আগে গেল কাসলাওয়ান, পরে গেল নিমুও। বহু জাহাজ, বহু লোকলশকর, সৈনিক পারিষদ নিয়ে সাড়ম্বরেই অভিযান বেরুলো, পর পর দুটো। কাসলাওয়ান ফিরলেন মাসেক কালের মধ্যেই, নিমুও ঠিক বারো দিনের দিন। সচিবসেনানী-ব্যূহভেদে সমর্থ হননি তাঁরা কেউই। হেনরিয়েটার দর্শনই মেলেনি অভাগ্যদের বরাতে।

এলেন রাজভ্রাতারা ফিরে। কিন্তু এ কী? আবার অভিযানের তোড়জোড় হয় কেন? এবার কে যাচ্ছে? রাজা নিজে? অসম্ভব! তিনি ত বিবাহিতই! তবে?

ক্রমে বোঝা গেল রহস্যটা। রাজা লাডের নিশ্চয় মাথা খারাপ হয়েছে। তা না হলে রাশি রাশি অর্থ অপচয় করতে উদ্যত হন ঐ লেভেলি ছোকরার জন্য? আরে ছিঃ!

লেভেলি! তাইত! রাজবংশের সন্তান ওটিও বটে। স্বর্গীয় রাজা বেলির এক জ্ঞাতি-ভাই ছিলেন, তাঁরই পুত্র। ছেলেটি ভাল।

কিন্তু, ভাল? ভাল হলেই কি ফ্রান্সের রানীর যোগ্য পাত্র হওয়া যায় নাকি? কাসলাওয়ান, নিমুও—এঁরাই কি ভাল নন? পারলেন তাঁরা রানী-রূপা পক্ষিণীকে খাঁচায় পুরে আনতে? অকারণ আরও কিছু অর্থব্যয় হবে আর কি! তবে অর্থটা রাজার, তিনি যদি তা উড়িয়ে দেন, কার কী বলার আছে?

বলার কিছু নেই, তবু বলছে লোকে। রাজা তা শুনছেন বই কি, কিন্তু কানে তুলছেন না। তোড়জোড় সমানে এগিয়ে চলেছে। লেভেলি প্রস্তুত হচ্ছেন। প্রস্তুতি যাতে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়, তার জন্য ব্যক্তিগত ভাবে তদ্বির করে যাচ্ছেন স্বয়ং রাজা লাড। মহার্ঘ সব পরিচ্ছদ তৈরি হয়েছে লেভেলির জন্য। যেমন পরিচ্ছদ ইতিপূর্বে অঙ্গে ওঠেনি কখনো তাঁর। রাজার নিজের একটি দামী ঘোড়াকে জাহাজে নিয়ে তোলা হয়েছে। ওটি ভাই লেভেলিকে দিয়ে দিয়েছেন লাড। ফরাসীদেশের মাটিতে নেমেই ঐ ঘোড়ায় সওয়ার হবেন লেভেলি। নামবেন গিয়ে প্যারির রাজপ্রাসাদের তোরণে।

লেভেলির জন্য এতখানি কোমলতা ছিল লাডের হৃদয়ে—একথা অন্যে পরে কা কথা, স্বয়ং লেভেলিও কখনো টের পাননি। রানীর পাণিপ্রার্থী হয়ে ফ্রান্সে যেতে পারবেন তিনি, এমন দুরাশাও তিনি করেননি কখনো। রাজবংশের সন্তান বটে, কিন্তু রাজপ্রাসাদে তিনি কোনদিন বাস করেননি। পৈতৃক ভবন যা তাঁর আছে, তা থেকে ফ্রান্সের মত অত্যুন্নত দেশ কোনদিন তার রাজা আহরণ করবে, একথা কোন বাতুলও কল্পনা করেনি কোনদিন। তবে এ ব্যাপারটা কী হচ্ছে? কেন হচ্ছে?

হচ্ছে এই কারণে যে রাজা লাড চক্ষুষ্মান ব্যক্তি। লেভেলি তাঁর চেয়ে বেশ কয়েক বৎসরেরই বয়ঃকনিষ্ঠ। অন্তরঙ্গতা দুজনে কোনদিনই ছিল না, কিন্তু দীর্ঘদিন থেকেই লাড তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে আসছেন এই জ্ঞাতি-ভাই লেভেলিকে। লক্ষ্য করবার মত ছেলে বলেই। কী সতেজ

এক মাসের মধ্যেই ব্রিটেনে সংবাদ এলো—লাডের অর্থব্যয় সার্থক হয়েছে এবার।

সেডার তরুর মত প্রাংশু দেহ! দেবরাজ ওডিনের মতই কী দৃপ্ত মহিমান্বিত মূর্তি। দুটি আঁখি কখনো করুণায় স্নিগ্ধ, কখনো বহ্নিমান—রৌদ্রদীপ্ত খর-তরবারির মতই।

কিন্তু শুধু দেহের রূপ দেখে মুগ্ধ হওয়ার লোক রাজা লাড নন। লেভেলির মনের পরিচয়ও তিনি অশেষ প্রকারে নিয়েছেন, পরোক্ষে এবং প্রত্যক্ষভাবে। যা দেখেছেন, তা তাঁর আশাতীত, কল্পনাতীতই বলা চলে। এত মহত্ত্ব আর এত প্রজ্ঞা, ঐ নবীন যুবার ভিতরে কি উদ্দেশে সমাবেশ করেছেন দেবতারা, তা তিনি বুঝতে পারেননি। কিন্তু মনে মনে তিনি সংকল্প করেছেন বহু আগে থেকেই যে, এত যে মহৎ, এমন যে বিজ্ঞ, তাকে কদাপি অখ্যাত কূপমণ্ডুকের জীবনযাপন করতে তিনি দেবেন না। তাকে কোন যোগ্য মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবেন তিনি। তাতে সারা পৃথিবীর উপকার হবে, হয়ত লাডের নিজেরও উপকার হবে একদিন।

তাই সহোদরেরা ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে আসার পরে তিনি নিজে যেচে লেভেলিকে পরামর্শ দিয়েছেন ফ্রান্সে যাওয়ার জন্য। সমস্ত ব্যয় নিজে বহন করবেন বলেছেন। স্বভাববিনয়ী লেভেলিকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছেন উচ্চাশায়। তাঁরই প্রেরণায় লেভেলি ক্রমশঃ নিজের সম্বন্ধে আস্থাশিল হয়ে উঠেছেন। ভাবতে শুরু করেছেন যে, নিজে রূপেগুণে অনন্য হলেও হেনরিয়েটা তাঁর চেয়ে যোগ্যতর পতি সারা পৃথিবীতেও পাবেন না খুঁজে।

অভিযান শুভযাত্রা করলো এবং এক মাসের মধ্যেই ব্রিটেনে সংবাদ এলো—লাডের অর্থব্যয় সার্থক হয়েছে এবার। গরবিণী রানী হেনরিয়েটা বাগদান করেছেন ব্রিটেনের রাজবংশধর লেভেলিকে। ফরাসী দরবার থেকে মন্ত্রী-পর্যায়ের কয়েকজন ব্রিটেনে চলে এলেন, এ-বিবাহে রাজা লাডের অনুমতি নেবার এবং শুভকর্মে তাঁকে আমন্ত্রণ করবার জন্য।

ব্রিটেনে সেদিন কি আনন্দের বন্যা! ব্রিটেনে ফ্রান্সে এতদিন সম্পর্ক ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতারই। এখন নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হবে হৃদ্যতা ও সহযোগিতার। সে কি কম লাভ?

লাড চলে গেলেন ফ্রান্সে, সপারিষদে। মাস-ব্যাপী আনন্দোৎসবের মধ্য দিয়ে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের মধ্যেকার সম্প্রীতির বন্ধনকে করে তুললেন অচ্ছেদ্য। তারপর নিজের রাজ্যকে আর বেশীদিন ত অবহেলা করা যায় না! লাড দিন স্থির করে ফেললেন স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের।

বিদায়ের ক্ষণে লেডেলি এবং হেনরিয়েটা উভয়েই

লাডকে জানালেন, ব্রিটেনের সম্পদে বিপদে ফ্রান্স এখন থেকে চিরদিনই থাকবে তার পাশে। লেভেলির জন্য লাড যা করেছেন, ফরাসী রাজবংশ তা কোনদিন ভুলবে না। লাড সাশ্রুনেত্রে বিদায় নিলেন ভাই ও ভ্রাতৃবধূর কাছ থেকে।

অতঃপর একদিন হেনরিয়েটাকে জিজ্ঞাসা করলেন লেভেলি—"রানি! তুমি আমাকে কোন্ রূপে দেখলে খুশী হবে?"

প্রশ্ন শুনে হেনরিয়েটা অবাক্—"তোমার কি অনেকগুলো রূপ আছে নাকি?"

"প্রত্যেকেরই আছে। তবে অন্যের কথা দিয়ে আমার প্রয়োজন নেই। নিজেরটা শুধু বুঝিয়ে বলি। এখন আমাকে তুমি যা দেখছ, তা একটা জগাখিচুড়ি ছাড়া কিছু নয়। বর্তমানে এই যে ফরাসী নরপতি লেভেলি মনুষ্যটি, এটি হল চার আনা সৈনিকের, চার আনা রাষ্ট্রনীতির, চার আনা শিল্পীর এবং চার আনা জ্ঞানান্বেষী সাধকের সমন্বয়ে গঠিত একটি যৌথ ব্যক্তিত্ব। এই ভাবেই আমাকে সারাজীবন দেখতে চাও যদি তুমি, আমি বিনা ক্লেশেই তা থেকে যেতে পারি। তার জন্য নতুন কিছু উদ্যমের আবশ্যক হবে না আমার। কিন্তু আমি তোমায় খোলাখুলিই বলে শোন। সে-রকম ভাবে জীবন কাটাতে হলে আমি নিজে খুশী হবো না। সেনাপতি হিসাবে তৃতীয় শ্রেণীর, রাষ্ট্রনীতিবিদ্ হিসাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর, শিল্পী ও জ্ঞান ভিক্ষুর ভূমিকায় চতুর্থ শ্রেণীর উপরে উঠতে অক্ষম হয়ে জীবনধারণ করবে যে লেভেলি, অন্যে তাকে তার রাজপদবির জন্য যত শ্রদ্ধাই করুক, আমি নিজে তাকে কৃপার পাত্র বলেই মনে করবো চিরদিন। আমার বাসনা, কর্ম, জ্ঞান, চিন্তাশক্তি সব একমুখী সাধনায় সংহত করে আমি যে-কোন একটা দিক দিয়ে মানব সমাজে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃতি লাভ করবো। এইখানেই তোমার মত আমার প্রয়োজন। কী ভাবে দেখতে চাও তুমি আমাকে?"

হেনরিয়েটা চিন্তা করলেন অনেকক্ষণ। তারপর বললেন—"ইচ্ছা করলে যে কোন একটা দিকে তুমি শ্রেষ্ঠ মানব, মহামানবের পর্যায়ে উঠে যেতে পার, এই যখন বিশ্বাস তোমার, তখন আমি বলি, তুমি হয়ে ওঠো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। জ্ঞান-সাধনার পথেই হোক তোমার চিরন্তন অগ্রগতি। সেনাপতি? ফ্রান্সে রণদক্ষ সেনাপতির অপ্রতুল নেই। তাঁরা দিগ্বিজয়ে সমর্থ না হতে পারেন, কিন্তু নিজের দেশের নিরাপত্তা রক্ষার শক্তি ও প্রতিভা আছে তাঁদের। আর দিগ্বিজয়? না, পররাজ্য গ্রাসের আকাঙ্ক্ষা আমার নেই, যার আছে, তাকে আমি ঘৃণা করি।

"রাষ্ট্রনীতিতে? রাষ্ট্রনীতি—আমি নিজেও একটু বুঝি। পিতা আমায় নিজে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন ও-বিদ্যায়। তাছাড়া আমার মন্ত্রীরাও বিচক্ষণ। আর শিল্পী? ফরাসী দেশের বারো আনা লোকই ত শিল্পসাধনায় তন্ময়! ও দলে ভিড় বাড়াবার অনুরোধ আমি করবো না আমার স্বামীকে, তাঁকে আমি সর্বজ্ঞানের আধার সত্যদ্রষ্টা রূপেই দেখতে চাই। জ্ঞানসাধনার পথেই আমার স্বামীর প্রতিভা বিকশিত হোক।"

"ঠিক আমার মনের কথাটি তোমার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়েছে রানি! তোমার মত সহধর্মিণী লাভ অনেক ভাগ্যের কথা। তোমার সহযোগিতায় আমি সিদ্ধিলাভ করবই সাধনায়।"

তারপর দীর্ঘযুগ কেটে গেল। ব্রিটেনে দেখা দিলো যুগপৎ ত্রিবিধ আপদ। প্রথম আপদ হলো কোরানিদের আক্রমণ। ঠিক কোন্ দেশ থেকে এরা এলো, কেউ জানে না। সংখ্যায় এরা অল্প, কিন্তু ভগবানের খেয়ালে এক অদ্ভুত বিদ্যার অধিকারী এরা। সারা ব্রিটেনে কোথায় কারা কী

পরামর্শ করছে তাদের বিরুদ্ধে, যত নিম্নস্বরেই আলোচনা চলুক, শত শত মাইল দূরে বসেও তারা তৎক্ষণাৎ তা জানতে পারবে। বায়ুতরঙ্গে ঈষৎ একটু তরঙ্গ উঠলেই তা তৎক্ষণাৎ তাদের কানে গিয়ে আঘাত করে। কাজেই তাদের নিপাতের জন্য যখন যে-মন্ত্রণাই হোক রাজা লাডের মন্ত্রণা-সভায়, মুহূর্তমধ্যে তা জেনে ফেলে শত্রুরা, সাবধান হয়ে যায় তন্মুহূর্তে। বহু মস্তিষ্কচালনার ফলে গড়ে তোলা পরিকল্পনা কাজে লাগানোর ফুরসুত পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় আপদ হলো একটা ভয়াবহ মর্মভেদী আর্তনাদ। দেশের প্রান্ত থেকে প্রান্ত পর্যন্ত একই সময়ে সর্বত্র শুনতে পাওয়া যায় তা, প্রতি সন্ধ্যায়। এমনি নারকীয় বিভীষিকা জড়িয়ে থাকে সেই বিকট চিৎকারে যে, তা শুনলেই প্রত্যেকটা ব্রিটন বিবর্ণ অবশ হয়ে যায়, অল্পবয়সীরা অনেকে যায় অজ্ঞান হয়ে, মানুষ জন্তু উদ্ভিদ, এক কথায় পৃথিবী যেন শ্মশানে পরিণত হয়ে যায়, নবসৃষ্টির শক্তি হারিয়ে।

তৃতীয় আপদটা আরও বিস্ময়কর। সেটা হলো এই যে, রাজপ্রাসাদের ভাণ্ডারে যত খাদ্যই এনে মজুদ করা হোক না কেন, এক রাত্রির বেশী তা কারও ভোগে আসে না। প্রথম রাতের ডিনারে যে যত পারে খেয়ে নিক। পরদিন সকালে দেখা যাবে যে খাদ্যভাণ্ডার শূন্য, গোলাবাড়িতে এক কণা রসদ নেই কোনরকম। কীভাবে যে পাহাড়প্রমাণ গম, যব, ওট আর জালা-জালা এল-বিয়ার রাতা-রাতি লোপাট হয়ে গিয়েছে, কোনরকমে তার হদিস পাওয়া যায় না। কয়েক বৎসর ধরেই বার বার এমনিই হচ্ছে।

ব্রিটেনের বিজ্ঞ ব্যক্তিরা এসব সমস্যার সমাধান খুঁজে পাননি। কিসে কী হচ্ছে, কোন ধারণাই তাঁদের মগজে ঢুকছে না। রাজা লাড কতদূর যে বিপন্ন, তা ভাষায় বোঝানো যায় না।

একটা কথা তাঁর মনে হয় মাঝে মাঝে। ভাই লেভেলির কথা। ফরাসী রাজসিংহাসনে আসীন হয়েও লেভেলি সংযমী তাপসের জীবন-যাপন করছেন বিবাহের পর থেকে। রাজকার্যে মনোনিবেশ করেন সামান্যই। অবশ্য তার তেমন প্রয়োজনও হয় না। রানী হেনরিয়েটাই মন্ত্রী ও সেনাপতিদের সাহায্যে অতি সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন দেশের প্রশাসন। রাজার দিন কাটে নগরের বাহিরে এক নিভৃত উপবনে। সেখানে শিলাবেদীতে আসন গ্রহণ করে তিনি সদাই সাধনায় মগ্ন। কখনো অধ্যয়নে, কখনো অনুধ্যানে। মাঝে মাঝে দূত বিনিময় হয় দুই রাষ্ট্রে। সেই দূতেদের মুখ থেকেই লাড শুনতে পান ধাপে ধাপে—লেভেলি কেমন করে নরদেবতার পর্যায়ে উঠে যাচ্ছেন ক্রমশঃ।

শুনতে পান। আর ভাবেন—রাজা লাড। ভাবেন যে, ব্রিটেনের এই সর্বনাশ ত্রিবিধ আপদ নিরাকরণের শক্তি কারও যদি থাকে পৃথিবীতে, তবে তা আছে ঐ নরদেবতা লেভেলির। জ্ঞান-সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন, ইউরোপখণ্ডের বিজ্ঞতম ব্যক্তি বলে তিনি আজ স্বীকৃত। অবশ্যই তাঁর অগোচর নেই যে ব্রিটেনের এ মহাসংকটের নিরসন কেমন করে হবে।

ভাবছেন—নিজে একবার ফ্রান্সে গিয়ে পরামর্শ করবেন ভাইয়ের সঙ্গে। কিন্তু সে-কষ্ট তাঁকে পেতে হলো না। একদা প্রভাতে এক ফরাসী অর্ণবযান এসে ভিড়লো ব্রিটেনের উপকূলে। আর ব্রিটেন-বাসীদের চমৎকৃত এবং পুলকিত করে তা থেকে নেমে এলেন স্বয়ং ফরাসী দেশাধিপ লেভেলি। নিজের দেশের বিপদের বার্তা তাঁর অজানা নেই। ধ্যানযোগেই তিনি তা জেনেছেন, এবং সঙ্গে

চোঙের এক মুখ লেভেলির মুখে আর অন্য মুখ লাডের কানে।

সঙ্গেই চলে এসেছেন রাজা লাডের কাছে। হেনরিয়েটার শত অনুরোধেও তিনি রাজকীয় সমারোহের সঙ্গে ব্রিটেন যাত্রা করতে রাজী হননি। এসেছেন সাদাসিধে নাগরিকের বেশে। নিজের দেশ, নিজের ঘরবাড়ি, সেখানে ঐশ্বর্য দেখাতে যাবো কাকে ?

লাড ত হাতে স্বর্গ পেলেন। লেভেলির কাছে খুলে বললেন তাঁর বিপদের বিবরণ। লেভেলি সব শুনে ধ্যানস্থ হয়ে রইলেন বহুক্ষণ। তারপর বললেন—"একটা লোহার চোঙ নিয়ে এসো।"

এলো চোঙ, তার এক মুখ নিজের মুখে সংলগ্ন করে অন্য মুখ স্থাপন করলেন লাডের কানে। কথা যা কইবেন লেভেলি, তা এই চোঙের মধ্য দিয়েই, যাতে সে-কথা হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়তে না পারে। কারণ হাওয়ায় ছড়িয়ে ফেললেই কোরানিরা শুনতে পাবে, সতর্ক হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে।

চোঙের ভিতর দিয়ে লেভেলি বললেন লাডকে—এক জাতীয় পোকা আছে, আমি বন থেকে তা ধরে দিচ্ছি এক হাঁড়ি। ঐগুলিকে পিষে এক জালা জলে মিশিয়ে দিতে হবে। সেই জল ওডিনের পূজার শান্তিজল বলে ছিটিয়ে দিতে হবে সব ব্রিটেনবাসীর গায়ে মাথায়। স্বভাবতঃই কোরানিরাও শান্তিজল নিতে আপত্তি করবে না। কিন্তু জলের এমনি গুণ, তার স্পর্শে সব কোরানিই সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়বে। অথচ প্রকৃত বৃটেনবাসীদের কোন অনিষ্টই হবে না ও থেকে।"

পরের দিন সেই শান্তিজলের গুণে সারা ব্রিটেন কোরানিমুক্ত হলো।

তারপর আর চোঙ ব্যবহারের দরকার নেই। প্রকাশ্যেই যুক্তি পরামর্শ চললো। ঐ নারকীয় আর্তনাদ ? ব্রিটেনের ঠিক কেন্দ্রস্থলে ভূগর্ভে দুটো ড্রাগন যুদ্ধ করছে আজ এক যুগ ধরে। ও আর্তনাদ তাদেরই। যে যখন মারাত্মক ভাবে আহত হয়, সেই তখন চেঁচিয়ে ওঠে ঐ ভাবে। ওদের নিধন করবার উপায় ? আগে একটা লোহার কফিন

তৈরি কর, দুটো অতিকায় ড্রাগনকে যার ভিতর পুরে ফেলা যায়।

কফিন তৈরি হলো কয়েকদিনের ভিতর। এখন জরিপ কর সারা ব্রিটেন। নিরূপণ কর কোন্‌টা এদেশের কেন্দ্রবিন্দু।

জরিপ সাব্যস্ত হলো—কেন্দ্রবিন্দু ঠিক অক্সফোর্ডে।

সইখানে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে নামতে লাগলো খনকেরা। কোদালের মুখে কী একটা গাছের আঠা মাখিয়ে দিয়েছেন লেভেলি। মাটি খোঁড়ার শব্দ টের পাচ্ছে না নীচেকার যুদ্ধরত ড্রাগনেরা। অবশেষে খুঁড়তে খুঁড়তে দেখতে পাওয়া গেল ওদের দুটোকে। যুদ্ধে অবসন্ন হয়ে দুটোই তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। সেই অবস্থাতেই তাদের উপরে একটা মায়ামন্ত্র উচ্চারণ করলেন লেভেলি, ও-ঘুম আর যাতে না ভাঙ্গে ওদের। তারপর দুটো ড্রাগনকে সেই লোহার কফিনে পুরে কবর দেওয়া হলো স্নোডনে। দ্বিতীয় আপদ দূর হলো ব্রিটেনের।

তৃতীয় আপদের প্রতিকারই দেখা গেল সবচেয়ে সোজা। এক অদৃশ্য মায়াবী দৈত্য এসে চুরি করে নিয়ে যায় রাজভাণ্ডারের সব খাদ্য। অদৃশ্যকে যাতে দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি একটা অঞ্জন লাডের দুই চোখে মাখিয়ে দিলেন লেভেলি। পরবর্তী ডিনারের রাতে সেই চোর দৈত্যকে দেখতে পেয়ে লাড নিজেই তাকে সংহার করলেন দ্বন্দ্বযুদ্ধে। বলাবাহুল্য দৈত্যনিধনের শক্তিও তাকে জুগিয়েছিলেন তপঃসিদ্ধ লেভেলি।*

* চতুর্দশ শতাব্দীরও আগেকার জনৈক অজ্ঞাতনামা লেখকের "লাড অ্যাণ্ড লেভেলি" নামক কাহিনী অবলম্বনে।

প্রতীক্ষা

শ্রীরাজারাম চৌধুরী

সারা জীবন ভোর
নানান ফুলে সাজিয়ে আছি
বাগানখানি মোর।

গন্ধে রঙে
শোভায় অনুরাগে
হইনি কৃপণ কভু
তবু আজও
এলে না ত প্রভু

ছায়ায় ঘেরা
উপবনের মাঝে
তোমার আসন
রেখেছি যে পেতে—

বসবে এসে
হৃদয় রাজা হয়ে
সেই আশাতেই
আছি তো পথ চেয়ে।

বুনো মানুষ নয় বনমানুষ

ডঃ রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

লণ্ডনের বৃটিশ মিউজিয়াম যেমন বিরাট, তেমনি বিরাট তার লাইব্রেরী। সেখানে দুনিয়ার সব রকম ইতিহাসের জ্ঞান জড়ো করে রাখা আছে। মানুষের তো বটেই, জানোয়ারদেরও। সেখানে সেই অদ্ভুত মহিলাটির সঙ্গে আমার আলাপ। তিনি ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায়-দশটায় হাজির দেন লাইব্রেরীতে। রাশি রাশি বইয়ের ভিতর ডুবে থাকেন সন্ধ্যে সাতটা অবধি। মাঝে মাঝে খাতায় নোট নেন। দুপুরে বাইরে লাঞ্চ খেয়ে আসেন চটপট আধঘণ্টার মধ্যে। এই লাঞ্চের টেবিলেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। মহিলাটির বয়স পঞ্চাশের কাছে। শান্ত মিষ্টি চেহারা। চোখের চাউনিটা ভারী কোমল, যেন একজন স্নেহময়ী মায়ের দৃষ্টি। জাতে জার্মান, কিন্তু ইংরাজী বলেন চমৎকার।

—কি বিষয়ে আপনি পড়াশুনো করেন? আমি জানতে চাই।

—এপ্‌দের সম্বন্ধে। জবাব দেন মহিলা মিষ্টি গলায়।

—মানে বানরদের সম্বন্ধে?

—না না। বানর আর এপ্ এক নয়। দুয়ের তফাৎ যথেষ্ট। ভদ্রমহিলা মৃদু গলায় আপত্তি তোলেন। এপ্ আর বানরে ততটাই তফাৎ, যতটা তফাৎ মানুষের সঙ্গে এপের। বানর জাত হল নানা জাতের লেজওয়ালা বানর, হনুমান—এরা। আর এপ্‌রা হল—

—তাদের কি বনমানুষ বলব? আমি জিজ্ঞাসা করি।

—হাঁ, তা বলতে পারেন। তবে বুনো মানুষ নয়, বনমানুষ। এপ্‌রা মানুষের মতো হলেও মানুষ ঠিক নয়।

আমি হেসে উঠি। বলি—ঠিকই বলেছেন আপনি। বুনো মানুষ তো মানুষই, আর বনমানুষ হল—

—গরিলা, শিম্পাঞ্জী, ওরাংওটাং আর সিবন (উল্লুক)—এদেরই বলে এপ্। এদের কারুরই লেজ নেই। সেদিক থেকে এরা বানরদের চেয়ে

মানুষদের অনেক কাছে। মালয় দেশের লোকেরা তাই নাম দিয়েছে ওরাং উটান, মানে জংলী মানুষ। স্বভাবেও প্রায় মানুষ। তুমি এপ্ দেখনি ?

—হাঁ। একটা শিম্পাঞ্জী দেখেছিলাম কলকাতার চিড়িয়াখানায়।

—সেটা কি করত ? উৎসুক প্রশ্ন করেন মহিলাটি।

—একটা খাঁচার মতো ঘরে কাঁচুমাঁচু মুখে চুপটি করে বসে থাকত। কখন কখন মেজাজ ভাল থাকলে একটা দোলনায় ঝুলে ঝুলে দোল খেত, আর দর্শকদের যদি কেউ আধখানা জ্বলন্ত সিগারেট ছুঁড়ে দিত, সেটা সে টেনে মুখ নাক দিয়ে ধোঁয়া বার করত। দর্শকরা মজা পেয়ে হাসত। তবে তাকে আমি বেশীর ভাগ সময় চুপচাপ বসে থাকতেই দেখতাম। এক সময় তার কি যে হল, সে বেচারা মরে গেল।

—আহা বেচারা! মহিলাটির গলার আওয়াজ দুঃখে ভারী হয়ে ওঠে। দেখি ওঁর চোখে প্রায় জল এসে গেছে। অবাক্ হই। আমার চোখে অবাক্ দৃষ্টি দেখে উনি অপ্রস্তুত। চোখ দুটো রুমালে মুছে নিয়ে বলেন—এপ্‌রা আমার সন্তানের মতো। তাই কোন এপ্ কষ্ট পেয়ে মারা গেছে শুনলে আমার মন ভারী খারাপ হয়ে যায়।

আমি আরও অবাক্ হই। জিজ্ঞাসা করি—আপনি কি বনমানুষ পোষেন ?

—হ্যাঁ, তা একরকম পোষাই বলতে পার। তবে আমি ওদের পুষি না, ওরাই আমাকে পোষে।

—কি রকম ? আমি কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করি।

—আমি জার্মানীর একটা চিড়িয়াখানায় এপ্‌দের তদারকির চাকরি করি। তবে চাকরি ঠিক চাকরি নয়। ওদের নিয়েই আমার কাটে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আঠারো ঘণ্টা।

—সেকি! আপনার নিজের ঘর-সংসার, ছেলেপিলে—

—বিয়েই করিনি আমি! এপ্‌গুলিই হল আমার ছেলেপিলে। আমি ওদের সঙ্গে বেড়াই, ওদের সঙ্গে এক টেবিলে খাই, ওদের সঙ্গে খেলা করি। বাচ্চাগুলো আমার গলা জড়িয়ে ধরে আমার বিছানায় শোয়। জান ? আমি ওদের জন্যে একটা কিণ্ডারগার্ডেন স্কুল করেছি। সেখানে আমি ওদের শিক্ষা দিই।

—তাজ্জব! মানুষের কিণ্ডারগার্ডেনে তো ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শেখে।

—শুধু লেখাপড়া কেন, মানুষ হতে শেখে। আমার কিণ্ডারগার্ডেনও ওরা মানুষ হতে শেখে। মানে, মানুষের মতো দাঁড়াতে, হাঁটতে, টেবিলে বসে সভ্যভব্য হয়ে খেতে, কায়দা কানুন রপ্ত করতে, নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রাখতে শেখে।

—আপনার কথা শুনে আমার ভারী মজা লাগছে। বনমানুষদের মানুষ করতে ভার নিয়েছেন আপনি! সোজা ব্যাপার নয়। ওদের সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই প্রচুর।

—হ্যাঁ, তা বেশ কিছুটা হয়েছে বৈকি। ওদের সঙ্গে আমি কাটাচ্ছি আজ প্রায় বিশ বছর। ওদের মন মেজাজ, ধরন ধারণ এখন বেশ ভালভাবেই বুঝতে পারি। তা ছাড়া বাচ্চাগুলোর বাপ মা বলতে তো আমিই।

—নিশ্চয় আপনার খুব মজা লাগে এ সব করতে ?

—হ্যাঁ, খুউব মজা লাগে। ওরা শুধু মজাদারই নয়, চমৎকার। ওদের বুদ্ধি বিবেচনা, চালাকি ফাজলামি, দুষ্টুমি, এমন কি ওদের স্নেহ ভালবাসা অনেক সময় আমার কাছে মানুষের চেয়ে বড় বলে মনে হয়।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ। ওরা শুধু কথাটাই বলতে পারে না মানুষের মতো, অথবা যে ভাষায় কথা বলে তার সবটা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি না। নইলে ওদের আমি নিতান্ত আপনজন ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারি না। ঠিক করেছি, আমি ওদের ওপর একটা বই লিখব। তাই ক'মাস ছুটি নিয়ে এখানে পড়াশুনো করছি।

—আমার কিন্তু ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে, আপনার অভিজ্ঞতার কথা শুনতে। ব্যাপারটা কি জানেন? আমার একজন আত্মীয় আসাম থেকে একটা উল্লুকের বাচ্চা ধরে আনেন কলকাতায়। আমার বয়স তখন ছ' সাত বছর। তাঁর স্ত্রী বাচ্চাকে বড় করেন ঠিক আপনার মতো আদর-যত্নে কোলে পিঠে করে। আমার সঙ্গে উল্লুকটার খুব ভাব হয়েছিল।

—কি নাম ছিল তার? মহিলা আমার গল্প শুনতে উৎসুক হন।

—বিচ্ছু, মানে ইংরাজীতে যাকে 'নটি' বলে আর কি! বড় হয়ে বিচ্ছু দু'পায়ে হেঁটে বেড়াত ঠিক সার্কাসের ক্লাউনের মতো নেংচে নেংচে। ট্রে-তে চা ভর্তি কাপ বসিয়ে দু'হাতে ধরে হেঁটে হেঁটে নিয়ে আসত, ঠিক মানুষের মতো। একটুও চা চলকে পড়ত না। আমার সঙ্গে বিচ্ছু বল খেলত, দৌড়ঝাঁপ করত। গাছে উঠতে সে দারুণ ওস্তাদ। বাড়ির পাশের বাগানে উঁচু উঁচু গাছের ডালে সে দাপাদাপি করে বেড়াত সারা দিন। লুকিয়ে লুকিয়ে দেখত সে সবাইকে। আমার হাতে চকোলেট লজেন্স কি অন্য কোন খাবার দেখতে পেলেই চিলের মতো ছোঁ মারত। তাকে ভাগ না দিয়ে কিছুই খাওয়া চলত না আমার। ফুর্তি হলেই সে লম্বা লম্বা হাত দিয়ে গাছের ডাল ধরে হুস হুস করে দোল খেত। আর মুখখানা ফুলিয়ে উকুউকু

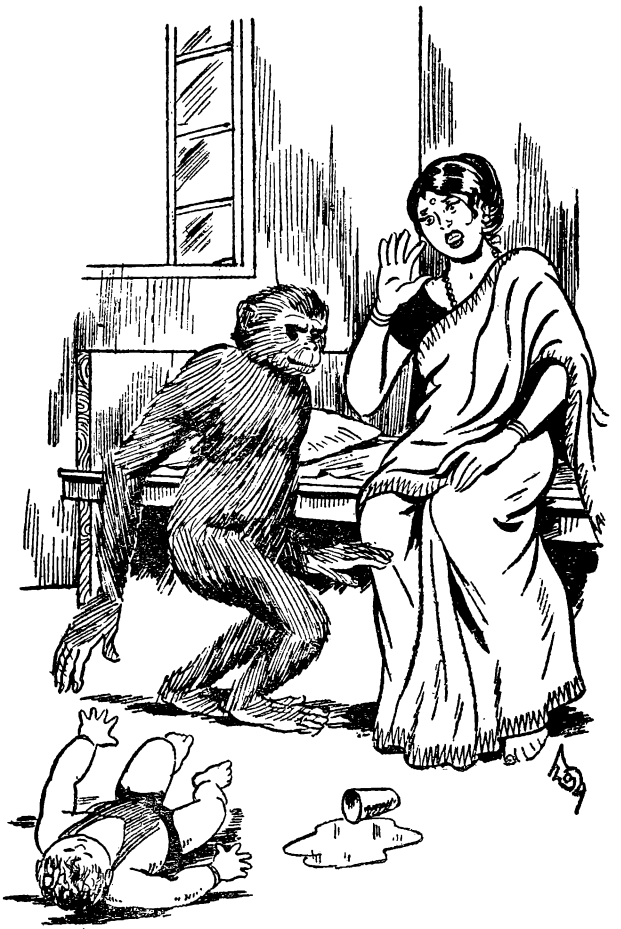

বিচ্ছু ছেলেটার ঠ্যাং ধরে ছুড়ে ফেলে দেয়। [পৃষ্ঠা ১০৬

—যে ভদ্রমহিলা তাকে কোলে পিঠে করে বড় করেছিলেন, তার ওপর কি রকম টান ছিল বিচ্ছুর? ভদ্রমহিলা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন।

—দারুণ। বিচ্ছুকে থাকবার জন্য বাগানের গাছে একটা বড় কাঠের বাক্স দিয়ে আস্তানা তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল। সেটা তার আদবেই পছন্দ হত না। সে রোজ রাতে জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকে মহিলার গলা জড়িয়ে ধরে বাচ্চা ছেলের মতো কোলের কাছে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে থাকত। এর মধ্যে মহিলাটির একটি ছেলে হল। ছেলেই তখন থাকত তার মায়ের কাছে। সে সময়ে বিচ্ছুর যা

ছেলেকে লুকিয়ে রাখতে হত। একদিন সুযোগ পেয়েই বিচ্চু সটান এসে ঘুমন্ত মহিলার কোলের কাছ থেকে ছেলেটাকে ঠ্যাং ধরে ছুড়ে ফেলে দেয়। বাচ্চাটার খুব জোর লেগেছিল। আর সেইদিনই বিচ্চুকে চিড়িয়াখানায় চালান করে দেওয়া হয়। যাবার আগে সে মহিলাটির গলা এমনভাবে আঁকড়ে ধরেছিল যে, কিছুতেই ছাড়বে না। শেষে তাকে জোর করে ধরে মুখ বেঁধে, হাত পা বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই সময়ে সে খুব কান্নাকাটি করছিল। তাই দেখে আমারও কান্না এসে গিয়েছিল।

মহিলাটি চুপচাপ আমার গল্প শুনে যান। হঠাৎ বলে ওঠেন—আমি যদি জানতে পারতাম, বিচ্চুকে তাহলে আমিই আনিয়ে নিতাম তোমাদের কাছ থেকে। একটু থেমে আবার বলেন—তুমি আজ সন্ধ্যাবেলা আমার বাসায় এস না, ডিনার খাবে। আর আমার এপ্‌দের গল্প শুনবে। যে লোক এপ্‌দের ভালবাসে আমি তাদের খুব পছন্দ করি।

আমি আনন্দের সঙ্গে রাজী হয়ে যাই।

॥ ২ ॥

—গরিলা, শিম্পাজী, ওরাং আর উল্লুক। এদের মধ্যে উল্লুকের জায়গা সবচেয়ে নীচে। বললেন মহিলাটি—গরিলা, শিম্পাজী কি ওরাং, ওদের মানুষের সঙ্গে মিল এতো বেশী যে সাধারণ লোকে মনে করে ওরাই হচ্ছে মানুষের আদি-পুরুষ। ওদের থেকেই মানুষ জাতটা এসেছে। আসলে তা নয়। মানুষ জাতের আর বনমানুষদের পূর্বপুরুষ এক। যেমন গাধা আর ঘোড়ার মধ্যে মিল যথেষ্ট থাকলেও গাধাদের থেকে ঘোড়ারা আসেনি। গাধা আর ঘোড়ার আদিপুরুষ হল এক।

খাওয়ার পরে দু'কাপ কফি বানিয়ে এক কাপ নিজে নিয়ে আর এক কাপ আমার হাতে দিয়ে সাউথ কেনসিংটনের একটা ফ্ল্যাটে আগুন-কাঁদায় বসে শীতের রাতে আমাদের গল্প জমে ওঠে। এখন ভদ্রমহিলা একাই বক্তা, আমি শ্রোতা। শুধু মাঝে মাঝে প্রশ্ন এগিয়ে ধরি।

—মানুষ আর বনমানুষের আদিপুরুষ জীবটি দেখতে ছিল কি রকম?

—খুব সম্ভবতঃ মাথায় উল্লুকের মতো, আর দেখতে বানরের মতো। তবে এটা ঠিক, তার কোন লেজ ছিল না।

—তা হলে লেজটাই হচ্ছে আসলে জানোয়ারের লক্ষণ, কি বলেন? আমি হাসতে হাসতে প্রশ্ন করি।

—হ্যাঁ, তা বলতে পারেন। উনিও হাসতে হাসতে জবাব দেন—লেজ খসে যাওয়াটা জানোয়ার থেকে মানুষের পর্যায়ে ওঠবার প্রথম পদক্ষেপ বলতে পারেন।

আমার মনে পড়ে যায় গ্রামের স্কুলের পণ্ডিত-মশায়ের বহুবার বলা কথাগুলো—ওরে বর্বররা, শ্রবণ কর। নরে বানরে তফাৎ শুধু ঐ 'বা'এর। বাঁদরামী করলেই নরের সামনে বসে 'বা', আর পিছনে গজায় লেজ।

—এপ্‌দের আদিপুরুষ যাই হোক, গরিলারা কিন্তু ওদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। পুরুষ গরিলারা তো আকছার ছ'ফিট লম্বা আর ওজনে সাতশো পাউণ্ড। মেয়ে গরিলারা এত বড় নয়। কিন্তু একটা সাধারণ গরিলা একটা সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশ লম্বা চওড়া। গরিলারা দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালে হাত দুটো হাঁটুর নীচে এসে পড়ে। মানুষের তুলনায় একটা গরিলা হল একটা দৈত্য। গরিলা দেখেছ?

—ছবিতে দেখেছি। স্কুলের পাঠ্যে একটা বর্ণনা পড়েছিলাম—হার্ডিং দ্য গরিলা। একটা

সিনেমাও দেখেছিলাম—কিং কং। ভীষণ হিংসুটে বদরাগী, ভয়ংকর জানোয়ার গরিলা। মানুষ দেখলেই তেড়ে এসে ধরে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে। গরিলাদের ভয়ে বনের সিংহ, হাতির পাল পর্যন্ত তটস্থ।

—ওসবের বেশীর ভাগই বানানো। বাজে কথা। ভদ্রমহিলা আমার কথায় বাধা দেন—আফ্রিকার নিবিড় জঙ্গলে দৈত্যের মত প্রকাণ্ড, কালো লোমে ঢাকা শরীর গরিলাকে দূর থেকে দেখে সভ্য মানুষ এই সব কল্পনা করে নিয়েছিল। এখন আমরা ওসব ভাবি না।

—তাই নাকি? গরিলারা তাহলে সাংঘাতিক নয়?

—মোটেই নয়। ইদানীং জঙ্গলের মধ্যে তাদের নিজেদের আস্তানায়, কি চিড়িয়াখানায় এনে গরিলাদের হাব-ভাব, আচার-আচরণ, বিশেষ ভাবে নজর করা হচ্ছে। দেখা গেছে ওরা এমনিতে খুব শান্তশিষ্ট। আর শুধু শান্তশিষ্ট কেন, আমি তো জানি, ওদের সঙ্গে ভাব জমাতে পারলে ওদের মতো বন্ধু তুমি আর দেখবে না। তবে ক্ষেপিয়ে দিলে, কি ঘা খেলে ওরা সিংহের চেয়েও ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে। ওদের শরীর যেমন প্রকাণ্ড, শক্তিও তেমনি প্রচণ্ড। ফল-মূল-কন্দ এই সব খেয়ে বাঁচলেও গায়ের জোরে ওরা বুনো হাতির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। তুমি আমার 'বুশম্যান' (আমি সঙ্গে সঙ্গে বাংলা তর্জমা করি 'জংলী') এর ছবি দেখবে?

বলতে বলতে উনি উঠে গিয়ে ঘরের ভিতর থেকে একটা এলবাম নিয়ে আসেন। তার দু' একটা পাতা উলটে বার করেন একটা ফটোগ্রাফ। মেলে ধরেন আমার সমুখে।

বাপ্ রে! কি সাংঘাতিক একটা জানোয়ার! সত্যি একটা দত্যি। সারা গায়ে কালো কালো লোম। কেবল ধান আছড়াবার পাটাখানার মতো চওড়া বুকে কোন লোম নেই। মোষের কাঁধের মতো পুরু কালো রুক্ষ চামড়া। প্রকাণ্ড একটা গুণ্ডা মানুষের মতো চেহারাটা। দু'পায়ের ওপর ভর নিয়ে উপু হয়ে বসে আছে একটা লোহার টুলের ওপর। একেবারে বেহদ্দ বুনো, রাগে যেন ফেটে পড়ছে। ভুরু দুটো কোঁচকান, বড় বড় গোল গোল নাকের গর্তের ওপর ফোলা ফোলা নাকের পাতা। খুদে চোখের চাউনিতে পর্যন্ত রাগ। কি ভয়ংকর! দেখলে বুকটা ছাঁৎ করে ওঠে। বললাম—দেখলে সত্যি ভয় লাগে।

মহিলাটি খিলখিল করে হেসে উঠে বললেন—ভয় পাবার কিছু নেই। ও অতি শান্তশিষ্ট ভদ্রলোক। ওর মুখ চোখের এই অবস্থা নেংটি ইঁদুর দেখে। নেংটি ইঁদুরকে ওর যত ভয়! ও এখন বড় হয়েছে, তবু ওর ভয় যায়নি। ও যখন ছোট ছিল—আচ্ছা আগে ওকে কিভাবে পাওয়া গেল শোনই সেই গল্প।

এমনিতে ইউরোপের বাজারে শিম্পাজী, ওরাং যথেষ্ট মিললেও গরিলা মেলা খুবই কঠিন। ক্বচিৎ কদাচিৎ একটা দুটো মেলে। আমি চিড়িয়াখানার এপ্ হাউসের ভার নিয়েই দেখলাম, গরিলা না হলে এপ্ হাউসের এক চোখ কানা। উঠে পড়ে লাগলাম গরিলা যোগাড় করতে। কিন্তু কাজটা সোজা নয়। একে ওরা থাকে আফ্রিকার অগম্য গহন অরণ্যে। মানুষ জনের সে জঙ্গলে যাওয়া অসাধ্য, অসম্ভব ব্যাপার। সেখানে সেই অন্ধকার কালো জঙ্গলে ওদের বাসা খুঁজে বার করা! সে প্রায় এভারেস্টের চূড়োয় ওঠার মতোই কষ্টকর। তার ওপর গরিলাদের দলও খুব ভারী নয়। একটা দলে যদি খুব বেশী থাকে তো আটটা। সাধারণতঃ তিনটে কি চারটে। সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার হল, ওরা ডাকে না।

কোন আওয়াজ দেয় না। এক একটা পুরুষ আবার একলাই ঘুরে বেড়ায় জঙ্গলে। ওরা বেশীর ভাগ সময় মাটির ওপরেই চলে বেড়ায়, চার হাত পায়ে। আর দৌড়তে পারে সাংঘাতিক বেগে। দৌড়ে ওদের পাকড়াও করা চাট্টিখানি কথা নয়।

—গরিলারা গাছের ওপরে থাকে না? আমি প্রশ্ন করি।

—হ্যাঁ, থাকে বৈকি। যখন খুশী ওরা গাছে চড়ে। তবে শিম্পাজী, ওরাং কি উল্লুকদের মতো গাছে চড়তে ওস্তাদ ওরা নয়। বোধহয় শরীরটা খুবই ভারী বলে। তবে ওরা রাত কাটায় উঁচু গাছের ডালে। কিন্তু সেও এক ভারী মজার ব্যাপার।

—কিরকম? আমি খুব উৎসুক হই।

—এক একটা পুরুষ গরিলার চার পাঁচটা বৌ থাকে, থাকে তাদের কাচ্চাবাচ্চা। পুরুষটাই দলের কর্তা, পালের গোদা। তার যেমন দাপট, তেমনি শাসন। সন্ধ্যে হলেই বৌরা তাদের বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে সুটসাট উঠে যাবে গাছের উঁচু ডালে, তাদের পাতা দিয়ে তৈরী বিছানাতে। এ বিষয়ে কর্তার শাসন বড় কড়া। হুকুম, সবাইকে চুপচাপ শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তে হবে। এদিক ওদিক করা চলবে না। গাছের ওপর সবাইকে তুলে দিয়ে কর্তা আশপাশের একটা গাছের গোড়ায় হেলান দিয়ে বসে পাহারা দেবে। ঐ গাছের গোড়াতেই বিছানা থাকে—তার বিছানা। তা সে বিছানাও গোদার উপযুক্ত। যা তা ব্যাপার নয়! সে ভারী পরিপাটি ব্যবস্থা। কত্তার আরাম ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা। বিছানাটা লম্বায় পাক্কা ন' ফুট, চওড়ায় দু' ফুট। অমন দত্যির মতো চেহারাটা ধরা চাইতো! প্রথমে গাছের ডাল চাপা দেওয়া হয়। তার ওপর বিছানো হয় পুরু করে, মানে ফুট দুই আড়াই পুরু করে পাতার রাশ। একেবারে স্প্রীং-এর গদি। ডানলোপিলোও বলতে পার।

ভদ্রমহিলা হাসতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে আমিও। হাসি থামিয়ে বলেন—বেলজিয়ান কঙ্গোর একটা ভীষণ ঘন জঙ্গলের ভিতর গরিলাদের যাতায়াতের রাস্তা নজর করবার জন্যে সুম্বা বলে একটা জংলীকে লাগান হয়। লোকটার চেহারাটা যেমন কালো তেমনি বেঁটে। এদিকে ভীষণ চালাক, আর ছুটতে পারে কাঠবিড়ালির মতো তুরতুর করে। গাছে চড়তেও সে দারুণ ওস্তাদ। সুম্বা মাস দুই জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে একদিন একটা পাহাড়ের ঢালুতে দেখতে পেল, একটা গরিলার কচি বাচ্চা লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা করছে। আর তার মা'টা পিছন ফিরে কচুর মতো কোন কন্দ খুঁড়ে তুলতে ব্যস্ত। আশপাশে দলের কোন পাত্তা নেই। সেই সুযোগে সুম্বা বাচ্চাটাকে ঝাঁ করে তুলে নিয়ে ভোঁ দৌড়। বাচ্চাটা কোনরকম আওয়াজ করবার আগে সে তার মুখটা ধরেছে হাত দিয়ে চেপে। মা গরিলা কিছু টের পাওয়ার আগে সুম্বা বাচ্চাটাকে নিয়ে একেবারে পগার পার। এনে দেয় সেই পর্তুগীজ ভদ্রলোককে, আমি যাকে বলে রেখেছিলাম গরিলার বাচ্চার জন্যে। ভদ্রলোকের ইউরোপের বাজারে ছিল ফলাও জানোয়ারের কারবার। তিনি আমাকে এনে দেন বাচ্চাটা। আমি শখ করে ওর নাম দিয়েছিলাম 'বুশম্যান'। বয়স তখন ওর মাস দুই। জার্মানীর ঠাণ্ডাতে এসে ওর ফ্লু হল। সেটা বিগড়ে দাঁড়াল নিউমোনিয়াতে। তখন ও আমাকে একদণ্ড কাছ ছাড়া হতে দিত না। আমি ওকে আমার নিজের শোবার বিছানার পাশে

থেকেই ওর অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল আমার গলা জড়িয়ে শুয়ে থাকা। বাচ্চাটা শেষ পর্যন্ত আমাকেই ওর মা মনে করতে শুরু করে। ওর জন্য আমি ভাল ভাল ডিজাইনের কতো সোয়েটার বুনে দিয়েছি।

—ও ভাল হয়ে উঠতেই ওকে আমি পুষ্টিকর খাবার খাওয়াতে লাগলাম। তাজা পাকা আপেল দিতাম। দিতাম কাঁচা আপেল সেদ্ধ চিনি দিয়ে। গরিলারা ছোট ছোট পাখি খায়, ডিমও খায়। তাই আমি ওকে চিকেন ব্রথ দিতাম, দিতাম মুর্গীর ডিম। ও কাঁচা ডিম খেতে খুবই ভালবাসত। দুধ দিতাম প্রচুর। এক মাসের মধ্যেই ওর স্বাস্থ্য ফিরে গেল!

আমি এবার প্রশ্ন করি—আচ্ছা, ওদের গায়ের ওপরকার লোম তো কালো। ওদের মুখের রং কি রকম?

—ওদের মুখের রং, পায়ের কি হাতের চেটোর রং, কিংবা চামড়ার রং মিশ কালো। একেবারে পোড়া মাটির মত। কিন্তু তা হলেও বুশম্যানকে আমার খুব ভাল লাগত। ওকে যা শেখাতাম, তাই শিখে নিত চটপট। এক বছরের মধ্যে টেবিলে বসে খাবার কায়দা রপ্ত করে নিয়েছিল। বেশ দিব্যি গুছিয়ে বসে, সুপের বাটি সামনে রেখে হাতে চামচে ধরে এমনভাবে সুপ খেত, মনে হত ঠিক মানুষের বাচ্চা। পরে ওকে আমি এনে রাখি চিড়িয়াখানাতে। ততদিনে ও বেশ বড় হয়ে উঠেছে। কিন্তু বড় হলে হবে কি? ওর ছেলে-বেলা থেকে ভয় নেংটি ইঁদুরকে। ইঁদুর দেখলেই ও ভয়ে ঘরের সবচেয়ে উঁচু জায়গায় উঠে বসবে। তখন ওর মুখে চোখে ফুটে উঠবে ভীষণ রাগ! কিংবা আমি যেখানেই থাকি না কেন, খুঁজে টেনে আনবে জামা ধরে। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে ইঁদুরটা যে দিকে পালিয়েছে। ও এখন বেশ বড়

আমি ওঁর গল্প শুনি আর আনমনে এলবামের পাতা ওলটাই।

হয়েছে। এখন ওর আনন্দ হলে বুক চাপড়ে ঢাকের মত আওয়াজ তোলে। আর খুব রেগে গেলে কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করে একটা আওয়াজ করে। তবে রাগে ও কদাচিৎ। তুমি এসো না আমাদের চিড়িয়াখানায়, দেখে যাও না আমাদের বুশম্যানকে।

আমি ওঁর গল্প শুনি আর আনমনে এলবামের পাতা ওলটাই। এক সময়ে জিজ্ঞাসা করি—আচ্ছা, সব গরিলাই কি আপনার বুশম্যানের মত বুদ্ধিমান?

ভদ্রমহিলা আমার হাত থেকে এলবামটা নিয়ে পাতা উলটে আর একটা গরিলার ফটো

বার করলেন। বললেন—একে দেখ। এর নাম জন দানিয়েল।

আমি দেখলাম পায়জামা আর কোট পরা একটা গরিলাকে। বললাম—এ যে একেবারে সভ্যভব্য মানুষের বাচ্চা। স্কুলে পাঠালেই হয়।

উনি হাসলেন। বললেন—ঠিক তাই। জনের সঙ্গে মানুষের বাচ্চার কোন তফাৎই ছিল না। অন্ততঃ জনকে যে মহিলা পালতেন, তিনি কোন তফাৎ করতেন না। ওর গল্প শুনলে তুমি তাজ্জব হয়ে যাবে। অবশ্য এর প্রত্যেকটি কথা সত্যি। আদবেই গল্প নয়।

মহিলাটি বলতে শুরু করেন—১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধের বছরে জুলাই মাসে জন দানিয়েলকে ইংলণ্ডে নিয়ে আসে একজন জানোয়ার ব্যবসায়ী আফ্রিকার ফরাসী গাবুন অঞ্চল থেকে। সেখানে তাকে জঙ্গল থেকে ধরে আনে ঐ সুম্বারই মত একজন জংলী, বছর তিনেক আগে। জানোয়ার ব্যবসায়ীটি জন দানিয়েলকে সেই জংলীটির কাছ থেকে কিনে এনে চড়া দামে বিক্রি করে দেয় লণ্ডনের অক্সফোর্ড স্ট্রীটের একটা বড় দোকানের মালিককে। আফ্রিকার খোলা মেলা জায়গা থেকে লণ্ডনের অক্সফোর্ড স্ট্রীটের দোকানের মত একটা বদ্ধ জায়গায় এসে জনের তো দম বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়। আলো নেই, হাওয়া নেই। তার অসুখ করে গেল। এক ভদ্রমহিলা রোজ আসতেন দোকানে জিনিস কিনতে। আর দোকানে এসেই তিনি কিছুক্ষণ আদর করে যেতেন জনকে। দুজনের মধ্যে বেশ ভালবাসাবাসি হয়েছিল। মহিলাটি অসুস্থ জনকে কিনে নিলেন দোকানের মালিকের কাছ থেকে। এনে রাখলেন তাঁর স্লোয়ান স্কোরের বাড়িতে। তিনি ছিলেন অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে, নাম মিস এলিজে কানিংহাম। বাড়িটা বেশ বড় সড়। প্রচুর আলো হাওয়া সেখানে। জনের জন্য একখানা আলাদা ঘর ঠিক করে দেওয়া হল। তাতে পাতা রইল নরম চওড়া বিছানা। জনকে মিস এলিজে মানুষ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন না। জন ছিল বাড়ির ছেলের মতো। সে সাজগোজ খুব পছন্দ করত। সেজেগুজে বাড়ির যেখানে খুশী সে ঘুরে ঘুরে বেড়াত। লোকজন তাকে দেখতে এলে সে খুব খুশী হয়ে তাদের হাত ধরে ভিতরে এনে সব কিছু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাত। ঘরের হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলত জন। খাবার সময় হলেই নিজের চেয়ার টেবিল সামনে টেনে এনে খেতে বসত বাড়ির আর পাঁচজনের সঙ্গে বেশ সভ্যভব্য হয়ে। অন্ধকার ঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে সে সুইচ টিপে আলো জ্বালতে পারত। সকালে উঠে বুরুশ দিয়ে দাঁত মাজত, আর গরম জলের টবে ডুবে স্নান করতে তার দারুণ মজা লাগত। স্নান করে উঠে শুকনো তোয়ালে দিয়ে সে নিজেই গা মাথা মুছত।

আমি অবাক্ হয়ে মহিলাটির কথা শুনি। মুখ থেকে আপনা আপনি বার হয়ে আসে—তাই নাকি? খুব আশ্চর্য কিন্তু!

—আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। গরিলার মস্তিষ্ক তো প্রায় মানুষের মতোই। কিন্তু যা বললাম, তার চেয়েও তাজ্জব ব্যাপার করেছে জন দানিয়েল। একদিন কি হয়েছে জান? একদিন বিকেলে কানিংহাম ধোপদুরস্ত ঝকঝকে পোশাক পরে বসে অপেক্ষা করছেন তাঁর বোনের। বোন এলে দু'জনে মিলে যাবেন নেমন্তন্নে। জন বায়না ধরল তাঁর কোলে উঠবে। এ সময়টাতে রোজই সে মিস কানিংহামের কোলে চেপে একবার বাইরে বেড়িয়ে আসে। এমন সময় মিস কানিংহামের বোন এলেন। জনকে বায়না করতে দেখে দিদিকে বললেন—ওটাকে এখন কোলে নিও না, পোশাক নোংরা হয়ে যাবে।

মিস কানিংহামও জনকে একটু ঠেলে দূরে সরিয়ে দিলেন। আর জনও তখুনি ছোট ছেলের মতো মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়ে কান্না জুড়ে দিল।

—এ্যাঁ কান্না জুড়ে দিলে? আমি অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করি।

—হ্যাঁ, সেইটাই তো অবাক্ হবার কথা। তারপর সে কি করল জান? একটু পরে কান্না থামিয়ে ঝাঁ করে উঠে ঘরের কোণে রাখা খবরের কাগজের গোছা থেকে একটা কাগজ নিয়ে মিস কানিংহামের কোলের ওপর বিছিয়ে দিয়ে, সে তার ওপর চড়ে বসল।

আমি ভদ্রমহিলার গল্প শুনে হাঁ হয়ে যাই। আবার জিজ্ঞাসা করি—এমন ঘটনা সত্যি?

ভদ্রমহিলা জোর দিয়ে বলেন—মিথ্যে ভাবার কোন কারণ নেই। মিস কানিংহামের ভাইপোর স্ত্রী আমার বিশেষ পরিচিত। তিনি এখনও বেঁচে আছেন। চল না, তাঁর বাড়ি যাই। ঘটনাটা তুমি তাঁর মুখ থেকেই শুনো। যখন ব্যাপারটা ঘটে, তিনি তখন সেই ঘরে উপস্থিত ছিলেন।

হঠাৎ ঘড়ির দিকে নজর পড়তে দেখি রাত সাড়ে দশটা বেজে গেছে। লজ্জা পেয়ে বলি—আপনাকে অনেকক্ষণ বিরক্ত করেছি। এবার উঠি। খুব ভাল লাগল আপনার মুখে গরিলাদের কথা শুনে।

ভদ্রমহিলা হাসি মুখে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন—শিম্পাঞ্জীরা কিন্তু গরিলাদের চেয়ে অনেক বেশী মজাদার। তাদের কথা আর একদিন আপনাকে শোনাব। আসবেন আসছে রবিবার এখানে লাঞ্চ খেতে?

আমি বলি—খুব আনন্দের সঙ্গেই।

তারপর শুভরাত্রি জানিয়ে সেদিনকার মতো বিদায় নিই।

মজার খেলা

পাশের ছবির মত একটা একসা সাইজের পাতায় নীচের দিকে পাঁচটি মাছের ছবি আঁক।

ছবির মাথার দিকে ঢেউ খেলানো রেখার মাথায় মাথায় একটা করে কাল বিন্দু আছে।

ঐ কাল বিন্দুতে পেন্সিলের মুখ রেখে চোখ বন্ধ করে রেখা টেনে মাছের মুখের মধ্যে আনতে হবে। যে এইভাবে যতগুলি মাছ ধরতে পারবে তার তত পয়েন্ট হবে আর পয়েন্ট যোগ করে যার বেশী পয়েন্ট হবে তার জিৎ হবে।

এ খেলা দুজন বা তার বেশী লোক নিয়ে খেলা যায়।

পেন্সিলের মুখ নীচে বা পাশে যেতে পারে ওপর দিকে যাবে না।

খেলাটা যত সহজ মনে হয় খেলতে বসলে তত সহজ মনে হবে না।

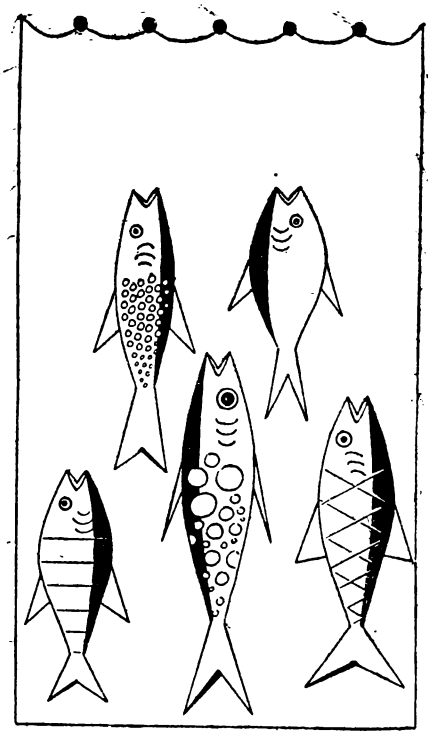

না--- না--- রাগ করব কেন? তুমি আমায় একটু ধরো।
ফাঁদ হরনদাসকে টেনে তুলল।
শেষে হরনদাস বাড়ী ফিরে ----
ওগো শুনছ--! ফাঁদের জ্বালায় আমার জীবনটা যে আর থাকে না। দেখ হতচ্ছাড়া আমার হাল কি করেছে!
হায় ভগবান! এ কী কাণ্ড? ফাঁদ তোমার এই দশা করেছে? ওকে ধরে দু ঘা দিতে পারলে না?

কেমন করে মারব? ওর ওপর রাগ করলে শত অনুঘায়ী ওকে দু ধামা টাকা দিতে হবে যে?

আচ্ছা,- ওকে জব্দ করার জন্যে অন্য কোন ফন্দি করলে হয় না?

আমার মাথায় কোন ফন্দিই আসছে না। কি যে করি?
শোন,- আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে...

কাল খুব ভোরে,- তুমি আমার সারা গায়ে, পাখীর পালক সাঁটা দিয়ে আটকে দেবে। আমি একটা গাছে ডালে বসে কোকিলের মত কুহু-কুহু করে ডাকব।

(চলবে)

নতুন জগতে টারজান

সব্যসাচী

১২

ওভার্লির নেতৃত্বে বন্দী কোর্সারেরা এদিকে সুড়ঙ্গ খুঁড়েই চলেছে। দিন দশেক খুঁড়বার পরে একদিন হঠাৎ এক কোর্সারের মাথায় হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ল বৃহৎ এক চাঙ্গা মাটি। ভূ-পৃষ্ঠ স্পর্শ করেছে ওদের সুড়ঙ্গ।

কতদিন পরে খোলা হাওয়ায় শ্বাস নিচ্ছে তারা। সবাই ঠেলে বেরুতে চায় সুড়ঙ্গ থেকে, উঠে পড়তে চায় উপরের মাটিতে। ওভার্লি তাদের নিরস্ত করল "কোথায় বেরুব, কাদের খপ্পরে গিয়ে পড়ব, তা না দেখে উপরে ওঠা যুক্তিযুক্ত হবে না"—বলল সে।

সর্দার কোর্সার মাংলুও সায় দিল সে-কথায়।

সত্যিই পরিবেশ খুব সুবিধের বলে তো মনে হয় না! একটা তুমুল কোলাহল শোনা যাচ্ছে নেপথ্য থেকে। সঙ্গে বহু রাইফেলের সমবেত নির্ঘোষ। বনভূমি থরথরিয়ে কাঁপছে যেন। কী এ? ভয়ঙ্করেরা ভয় পেয়ে পালাচ্ছে দূরে দূরে। কেউ গোসাপের পিঠে চড়েই, কেউ আবার বাহনের পৃষ্ঠচ্যুত হয়ে নিজেরাই হাঁচোড়-পাঁচোড় করে গড়াতে গড়াতে এগুচ্ছে মাটি ধরে ধরে। তাদের সে-গতিভঙ্গী যেমন করুণ, তেমনি হাস্যকর।

কিন্তু হল কী? রাইফেল কাদের? মাংলুরা তা বুঝতে না পারলেও ওভার্লি বুঝেছে। বুঝতে পেরেছে যে ০'৪৪০-এর কোন একটা খোঁজারু দল তারই সন্ধানে এসে পড়েছে এদিকে, এবং ভয়ঙ্করদের উপরে শুরু করেছে গুলিবর্ষণ। হেতু? অবশ্যই ঐ দুর্বৃত্ত ভয়ঙ্করেরাই কোন রকম হামলা করে থাকবে তাদের উপর। করে থাকে যদি, উচিত সাজাই হয়েছে সে-পাপের। মানুষ-জন্তু যাকে দেখবে তাকেই পেটে পুরবার ঝোঁক যে ভাল নয়, এ-বোধটা এইবার হয়তো আসবে ওদের মাথায়।

কিন্তু ভয়ঙ্করেরা এদিকেও আসছে অনেকে। এক্ষুণি ওভার্লিদের সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে পড়া নিরাপদ হবে না। কারণ পলায়মান হলেও ভয়ঙ্করেরা এখনও সংখ্যায় বিপুল। তারা পালাতে পালাতেও বল্লমের খোঁচায় এই পাঁচটা শত্রুকে ঘায়েল করে যেতে পারবে। কারণ এরা তো নিরস্ত্র।

না, সুড়ঙ্গ থেকে ওরা এক্ষুণি বেরুবে না। রাইফেলওয়ালারা আরও নিকটে আসুক। তখন সবাই মিলে চিৎকার করে ডাকা হবে ওদের। ওভার্লিরা আবার মাটির তলায় ঢুকে যাবে,

হ'তের মাথায় শুকনো ডালপালা যা পাবে, কুড়িয়ে নিয়ে সুড়ঙ্গ মুখটা যথাসম্ভব ঢেকে রাখবে আপাততঃ!

তাই করল তারা। কিছুক্ষণ পরে হল্লাটাকে আরও নিকটবর্তী মনে হতে লাগল। যাক, পাশ কাটিয়ে চলে যাক ওরা। হল্লা কমে এলে ওভার্লিরা মাথা তুলবে আবার।

কিন্তু তর সইল না তার।

হুড়মুড় করে শুকনো ডালপালাগুলো ভেঙ্গে পড়লো ওভার্লির মাথার উপরে। আর উপর থেকে একটা মানুষ এসে ডিগবাজি খেয়ে পড়ল একেবারে তার ঘাড়ে। তাকে ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলতে গিয়েই ওভার্লির হাতে ঠেকল এক রাশি এলায়িত চুল। আর কানে এল এক অস্ফুট ভয়ার্ত চিৎকার।

নোরা! লেগলা-কমলিনী! ওভার্লির এত ঘোরাঘুরি বিপদ-আপদের মূল যে, সে এসে আচমকা অবতীর্ণা হয়েছে এই সুড়ঙ্গের ভিতর, একেবারে ওভার্লিরই কাঁধে। দুইজনে দুইজনের দিকে তাকায়, শেষ পর্যন্ত হেসে ফেলল দুজনেই।

জিনিসটা ধাঁধার মত লাগছে। এভাবে দেখা হয়ে যাবে, একথা না ভেবেছে নোরা, না ভেবেছে ওভার্লি।

ধাঁধার সমাধান করল টারজান, নোরার পিছনে পিছনে সুড়ঙ্গে নেমে এসে। নোরাকে উদ্ধার করে সে যখন ওয়াজিরিদের সঙ্গে পুনর্মিলিত হবার জন্য যাচ্ছিল, তখনই হঠাৎ ডালপালা দিয়ে ঢাকা সুড়ঙ্গের মুখে পা পড়ে যায় তার। কোনরকমে সে নিজে টাল সামলে নিয়েছিল বটে, কিন্তু তার কাঁধ থেকে ছিটকে নোরা পড়ে গিয়েছিল সুড়ঙ্গের ভিতর। এখন টারজানও কাজে কাজেই নেমে এসেছে নোরার সন্ধানে।

টারজানের সঙ্গে মিলিত হতে পেরে কী আনন্দ

"এই বিপদের ভিতরে আমিই আপনাকে টেনে এনেছি।"

ওভার্লির! সে আজ সব ক্লেশকে সার্থক মনে করছে। "মিলর্ড গ্রেস্টোক! মিলর্ড গ্রেস্টোক!" —বলে বারবার তার দুহাত জড়িয়ে জড়িয়ে ধরে ভাবের আবেগে—"এই বিপদের ভিতরে আমিই আপনাকে টেনে এনেছি।"

"ভুল বন্ধু, ভুল!"—হেসে জবাব দেয় টারজান —"বিপদের কেমন স্বভাব, সে নিজেই আমাকে টেনে আনে তার কাছে। তুমি উপলক্ষ মাত্র। এখন উপরে চল, ওয়াজিরিদের কথা শুনতে পাচ্ছি।"

কোর্সার চারজনই এখন বস্তুতঃ এদের বন্দী, কারণ টারজানের রাইফেলধারী ওয়াজিরিরা এসে পড়েছে ইতিমধ্যে। শক্তি পরীক্ষার চেষ্টা করতে গেলে কোর্সারদের বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং সে দিক দিয়ে তারা গেলই না। নিরীহ-ভাবে অনুগামী হল টারজানের।

তবে কথা এই, টারজান বা ওভার্লি পথ চেনে না। কোর্সারদের অন্ততঃ খানিকটা ধারণা রয়েছে যে, যেতে হবে কোন্ দিকে। মাংলু বলল—"আমার মত যদি গ্রহণ করেন, আমি বলব, কামেং নদীর দিকেই আমাদের ফিরে যাওয়া উচিত। সেই নদীতে এখনও হয়ত আমাদের ছিপখানা বাঁধা রয়েছে। সেটা যদি পেয়ে যাই, আমরা নির্বিঘ্নে রেলা উপসাগরে পৌঁছোতে পারব। সেখানে জাহাজ রয়েছে আমাদের প্রতীক্ষায়। জাহাজে যদি আপনারা উঠতে না চান, ছিপ নিয়ে যেদিকে খুশী চলে যেতে পারবেন। আপনাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ত আর কেউ কিছু করাতে পারবে না আপনাদের দিয়ে। ঐ আগুন-লাঠির দৌলতে আপনারা ত অপরাজেয়।"

এই যুক্তিই গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করল টারজান। ওদের দলটা আবার সেইদিকে ফিরে চলল, যেদিক থেকে কুমীরমুখোরা ধরে এনেছিল ওভার্লিসহ কোর্সারদের। দীর্ঘ পথযাত্রা। সময়-সাপেক্ষ এবং বিরক্তিকর। কিন্তু অবশেষে একদিন তাদের সেই পরিক্রমার অবসান হল, কামেং নদীর কূলে পৌঁছে তারা উল্লাসে কোলাহল করে উঠল সবাই। ছিপখানা নদীর জলে পূর্বস্থানেই ভাসছে।

এবার নৌকায় উঠে বসা। দাঁড় ধরেছে ওয়াজিরিরা এবং কোর্সাররা। তার উপরে নদীস্রোত ত একটানা বইছেই রেলার দিকে। টারজানের কোন কাজ নেই, সে বসে বসে নিরীক্ষণ করছে ওভার্লি আর নোরার হাবভাব। দুটিতে ওরা সারাক্ষণ পাশাপাশিই বসে আছে, কথা কইছে আধ-আধ মৃদু গুঞ্জনে। অন্যের পক্ষে তা শোনা অসম্ভব, শোনারও কোন দরকার নেই। যে কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি দুই মিনিটেই বুঝতে পারবে যে, এ-দুটির মিলন ঘটলে খুব সুখেরই হবে, না ঘটলে দুঃখের পার থাকবে না এদের।

টারজান ভাবে, বাধা কি মিলনের ওদের? মিলনের মধ্যে দিয়ে যদি পুরোনো পৃথিবীর সঙ্গে এই নতুন পৃথিবীর একটা যোগসূত্র স্থাপিত হয়, তাতে দোষ কী? সম্রাট থিওডোর এক ধরনের যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন বটে, কিন্তু হিংসা আর রক্তপাতের ভিতর দিয়ে যে-বন্ধন আসে, তা স্থায়ী হয় না, তার ফলও শুভ হয় না। তাই দীর্ঘদিন প্যানথিয়নের এক বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগে রাজত্ব করার পরে আজ কোর্সার-কারা থেকে তাঁকে উদ্ধার করবার জন্য টারজানকে আসতে হয়েছে অভিযান সাজিয়ে।

তাই এবার যদি একটা সম্প্রীতির যোগ ঘটেই যায়, যাক না। শিক্ষা দীক্ষা সংস্কৃতির আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে বটে, কিন্তু সে-ব্যবধানের উপরে সেতু গঠন শক্ত মোটেই নয়, যদি নাকি বনিয়াদ থাকে মজবুদ। তা এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই আছে। সে বনিয়াদ ভালবাসার।

দেখতে দেখতে কামেং নদী এসে রেলা সাগরে মিশল। কোর্সারেরা আনন্দে কলরব করে উঠল, কারণ তাদের জাহাজ যেখান থাকবার কথা, আছে সেইখানেই। গিয়েছিল তারা পঞ্চাশজন, ক্রীতদাস ধরে আনবার জন্য, যেমন চিরকাল আনছে। এবারে দৈবদুর্বিপাকে তারাই ধরা পড়ে গেল কুমীরমুখো ভয়ঙ্করদের হাতে। শুধু ধরা পড়া নয়, পঞ্চাশ-জনের মধ্যে মারাই গড়ল পঁয়তাল্লিশ জন। বাকী পাঁচজনও যে বেঁচে ফিরেছে, সে তাদের নিজের কোন বাহাদুরিতে নয়, ফিরতে পেয়েছে শুধু এই কারণে যে, তাদের সঙ্গে ছিল অন্য পৃথিবীর এক দুর্ধর্ষ অভিযাত্রী।

কিন্তু আনন্দ কলরব করার মত উপলক্ষ শুধু পঞ্চ কোর্সারেরই বরাতে আসেনি আজ, এসেছে টারজান, ওভার্লি, ওয়াজিরিদের ভাগ্যেও। আকাশে একটা গম্ভীর বোঁ-ও-ও আওয়াজ শুনে

সচকিতে সবাই উপরপানে তাকাল। আর অমনি ওয়াজিরিরা লাফিয়ে উঠল জয়ধ্বনি করে। টারজানও উঠে দাঁড়িয়েছে তখন, হুকুম দিচ্ছে—"ফায়ার"। সঙ্গে সঙ্গে ওয়াজিরিদের দশটা রাইফেল একসাথে গর্জে উঠে সংকেত জানাল উড্ডীয়মান মহাব্যোমযান ০ ৪৪০কে।

টারজান ঠিকই অনুমান করেছিল ; সে এবং ওভার্লি দুজনই যেখানে নিখোঁজ, সেখানে দায়িত্বশীল কাপ্তেন জ্যুভার্ট কখনো নিশ্চিন্ত হয়ে প্লেন নিয়ে মাটিতে বসে থাকতে পারেন না। অবশ্যই তিনি খুঁজতে বেরিয়েছেন এবং খোঁজার জায়গা হিসাবে সমুদ্র-অঞ্চলের আকাশই বেছে নিয়েছেন।

ওয়াজিরিদের রাইফেলের আওয়াজ শূন্যে মিলিয়ে যেতে না যেতেই জ্যুভার্ট দূরবীন হাতে দেখা দিলেন প্লেনের চতুর্থ ডেক-এ। টারজানের সিংহচর্মই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল সকলের আগে। তারপর ওয়াজিরিদের চিনতেও তাঁর দেরি হল না কিন্তু ভদ্রলোক ধোঁকায় পড়ে গেলেন নোরাকে দেখে। জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে টারজান, ওভার্লি এ রত্নটি জোটাল কোথা থেকে ?

০'৪৪০ চক্কোর দিতে দিতে নামছে। নোরা ভয়ে আড়ষ্ট। তার ধারণা, এ আর এক অজানা জাতের মহা-থিপডার ছাড়া অন্য কিছু নয়! সে ভয়ার্তভাবে আকাশপানে তাকায়, আর ঘনিয়ে আসে ওভার্লির আরও কাছে।

ভয় পেয়েছে কোর্সারেরাও। নিদারুণ ভয় পেয়েছে। ছিপে রয়েছে মাংলুরা, তারা টারজান ও তার সঙ্গীদের আড়ালে লুকোবার চেষ্টা করছে। এই রহস্যময় বিদেশীদের সঙ্গে ঐ নভশ্চর বস্তুটার সম্পর্ক কিছু-না-কিছু আছে বলেই তাদের সন্দেহ। ভাবছে, এদের আশ্রয় যদি তারা আঁকড়ে থাকতে পারে, দ্রুত-অবতরণশীল ঐ পদার্থটার আক্রমণ থেকে তারা পেতেও পারে রেহাই।

জাহাজেও রয়েছে আরও বিস্তর কোর্সার। তারা দূরে পালাবার জন্য ব্যস্ত। তবে যে-ধরনের জাহাজে তারা সমুদ্রে বেরিয়েছিল, ইচ্ছে করলেই তাদের ঘোরানো ফেরানো, দূরে সরানো চলে না। অনেক দাঁড় টানতে হবে, হাল ধরে অনেক কসরৎ করতে হবে, মাস্তুল থেকে কোন পাল হবে নামাতে, কোন পাল বা ওঠাতে হবে। সময় লাগবে। তার মধ্যেই যদি ঐ গর্জমান রাক্ষস ঝাঁপিয়ে পড়ে জাহাজের উপরে ত হয়েই গেল সব শেষ। পাথর ছুঁড়বার মত বন্দুক তাদের আছে বটে, আছে ডজনে ডজনে তার আর বল্লম, কিন্তু সে-সবের প্রয়োগে ঐ আশ্চর্য জিনিসটাকে নিরস্ত করা যাবে বলে আশা তারা করতে পারছে না।

যা হোক, ভয় যে পাবার সে পাক, ছিপে বসে টারজানেরা উল্লাস করছে। প্লেন নামছে। এ প্লেন যেমন আকাশে ওড়ে, তেমনি জলেও ভাসতে পারে। মসৃণভাবে এসে বসে গেল সমুদ্রের বুকেই। ওদিকে কোর্সারদের জাহাজ, এদিকে কোর্সারদের ছিপ, এ-দুইয়ের ঠিক মাঝখানেই।

টারজানের ইঙ্গিতে ওয়াজিরিরা প্লেনের গায়ে নিয়ে ছিপ ভিড়িয়ে দিল। তুমুল আনন্দ কোলাহলের মধ্যে কাপ্তেন জ্যুভার্ট এলেন এগিয়ে, হাতে ধরে প্লেনে তুললেন টারজানকে। তারপরেই ওভার্লি ঠেলে এগিয়ে দিল নোরাকে। তাকে তুলে নেওয়ার ভার টারজানের উপরে দিয়ে কাপ্তেন পাশে সরে দাঁড়ালেন। কারণ মহিলাটি যে প্লেনের লোকজনকে দেখে ভয় পেয়েছেন, তা তাঁর মুখ চোখের চেহারা থেকেই প্রকাশ।

একে একে সবাই উঠে বসল, ছিপখানাকে নিয়ে মাংলু ছাড়া অন্য চার কোর্সার চলে গেল কোর্সার জাহাজের কাছে। সেখানে গিয়ে তারা গল্প শুরু করল এই অত্যাশ্চর্য বিদেশীদের শৌর্যবীর্য আর বুদ্ধির কাহিনী নিয়ে।

—"তুমি ফিরে যাও ওদের আকাশযানে।"

তার খানিকটা বাদে একখানা ছোট্ট বোট প্লেন থেকে নামল। বোটও একখানা প্লেনের খোলে ছিল বই কি!

সেই বোটে আসছে এক মাংলু। সে এসে জাহাজে উঠল এবং কাপ্তেনকে অভিবাদন করে টারজানের নমস্কার এবং শুভেচ্ছা তাঁকে জ্ঞাপন করল। টারজান বার্তা পাঠিয়েছে একটা। দীর্ঘ এবং নরম-গরম একটা বার্তা। তাই এখন মাংলুসর্দার শোনাচ্ছে তার কাপ্তেনকে।

টারজান চেয়েছে বন্দী থিওডোরের মুক্তি। পত্রপাঠ মুক্তি। এক্ষুণি এই জাহাজ চলে যাক কোর্সার রাজধানীতে এবং সেখান থেকে নিয়ে আসুক কারামুক্ত থিওডোরকে। না যদি আনে, তাহলে বোমা ফেলে কোর্সার-রাজধানী এক্ষুণি বিচূর্ণ করে ফেলা হবে।

বোমা? সে আবার কী? জিজ্ঞাসা করেন কাপ্তেন।

মাংলু ইশারায় দেখাল আকাশের দিকে।

প্লেনে খোঁজারু বিমান দু'খানা ছিল গোড়ায়। একখানা নিয়ে ওভার্লি বেরিয়েছিল টারজানের খোঁজে এবং সে-একখানা ভেঙেও পড়েছিল শকুনের ডানার ঘায়ে। বাকী খোঁজারুখানা নিয়ে আবারও আজ বেরিয়েছে ওভার্লি, চলে গিয়েছে সমুদ্রকূলে এক বৃহৎ মহীরুহের কাছাকাছি। সেখানে দাঁড়িয়ে পড়েছে হাওয়ায় ভর করে। আর তার উপর থেকে মহাশক্তিধর একটা ক্ষুদ্র বোমা সেই মহা-বৃক্ষের উপরে ছুঁড়ে মেরেছে ওভার্লি। ছুঁড়ে মেরেই দে ছুট! প্রাণপণ বেগে খোঁজারুকে নিয়ে পিছু হটে এসেছে ও।

না যদি আসত, কী হত ওর? যা হচ্ছে ঐ নিরপরাধ বৃক্ষটার, তাই হত আর কী। গাছটা ভেঙেচুরে গুঁড়ো হয়ে পড়েছে, একটা বিধ্বস্ত পাহাড়ের মত। শুধু তাই নয়, জ্বলছেও দাউ দাউ করে। লেলিহান অগ্নিশিখা আকাশ স্পর্শ করেছে প্যান্‌থিয়নের, জাহাজ থেকে কোর্সারেরা তা নিরীক্ষণ করছে ভূতাবিষ্টের মত আড়ষ্ট হয়ে। আগুন নিবল অতবড় গাছটাকে একেবারে ছাই-গাদায় পরিণত করে।

মাংলু তখন বলছে তার কাপ্তেনকে—"বিদেশীদের রাজা টারজান এই কথাই বলতে বলেছেন আমায়—'ওঁদের সম্রাটকে এনে ওঁদের কাছে পৌঁছে না দেওয়া হলে আমাদের রাজ্য, রাজধানী সব ধ্বংস করে দেওয়া হবে ঐভাবেই।'

কাপ্তেন ভাবলেন একটু, তারপর মাংলুকে বললেন—"তুমি ফিরে যাও ওদের আকাশযানে। গিয়ে ওদের রাজা টারজানকে বুঝিয়ে বল, আমি এক্ষুণি রাজধানীতে চলে যাচ্ছি, আমাদের সম্রাটকে বোঝাবার জন্য। তাঁকে ঐ বিদেশীদের পরাক্রমের

কথা জানালে, আমার ত মনে হয়, সারি-সম্রাটের মুক্তি সম্বন্ধে কোন গোল হবে না। মুক্তি না দিলে যে আমাদের ধ্বংস কেউ ঠেকাতে পারবে না, তা আমি বোধ হয় আমাদের সম্রাটকে বোঝাতে পারব। টারজানকে বলবে, তিনি যেন অধীর না হন।"

কিছু কালক্ষেপ যে অনিবার্য, তা কি আর বোঝে না অভিযাত্রারা? তারা ধৈর্য ধরেই প্রতীক্ষা করবে, কোর্সার-সম্রাটের শুভবুদ্ধি-উদয়ের আশায়। রক্তপাত তারা এড়াতে চায়, খাঁড়াদাঁতী থিপডারে মিলে প্যানথিয়নে যথেষ্ট রক্তপাতই করে যাচ্ছে চিরদিন। পুরোনো পৃথিবী থেকে এসে এরা কেন আর সেই রক্তস্রোতে নতুন করে বেগ সঞ্চার করে!

টারজান মজা পাচ্ছে খুব। ওভার্লির সঙ্গে নোরার অন্তরঙ্গতা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। টারজান দূর থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, আশা করছে পরিণতির। ওভার্লি মার্জিত রুচির বিজ্ঞানী পুরুষ, সে কি আর ছেলেখেলা করবে একটা নিষ্কলুষ কুমারীর সঙ্গে?

অবশেষে একদিন কোর্সারদের জাহাজকে দেখা গেল চক্রবাল রেখায়। শ্বেত পতাকা উড়ছে জাহাজের মাস্তুলে। ০-৪৪০ এগিয়ে গেল তার দিকে। প্লেন থেকে সিঁড়ি নামিয়ে দেওয়া হল জাহাজে। আর সেই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলেন সম্রাট থিয়োডোর, যাঁর উদ্ধারের কামনায় পুরাতন পৃথিবী থেকে এই নতুন পৃথিবীতে অভিযান করেছে ০-৪৪০।

"আমিই থিওডোর। আপনাদের ধন্যবাদ দিই বন্ধুগণ!"—এই বলে থিওডোর হাত বাড়িয়ে দিলেন টারজানের দিকে। কোর্সারের কাপ্তেনের মুখ থেকে অভিযানের নেতা এই সিংহচর্মধারী সিংহহৃদয় পুরুষের কথা শুনেছেন সম্রাট। "আমি যখন প্রথমে চলে আসি পুরাতন পৃথিবী ছেড়ে, তখনই আপনার কীর্তিকথা কিছু কিছু শুনে এসেছিলাম সেখানে। আপনি লর্ড গ্রেস্টোক।"

"তা বটে" হাসিমুখে বলল টারজান—"কিন্তু টারজান বলে পরিচিত হতেই আমি ভালবাসি।"

ওভার্লি একথায় মন্তব্য করল—"কারণ পুরোনো পৃথিবীতে লর্ড আছেন বহুজন। কিন্তু টারজান আছেন মাত্র একজন। এক এবং অদ্বিতীয়।"

দীর্ঘ কারাবাসেও সম্রাট থিওডোরের তেমন কিছু স্বাস্থ্যহানি ঘটেনি। কোর্সার রাজদরবার মোটামুটি ভদ্র ব্যবহারই করেছে তাঁর সঙ্গে। কারণ তাদের মনে গোড়া থেকেই ভয় ছিল, অসদ্ব্যবহার করলে পুরাতন পৃথিবীর রোষানলে একদিন নিশ্চয়ই দগ্ধ হতে হবে প্যানথিয়নকে।

"এইবার তাহলে সারি যাওয়া যাক?"—বলল টারজান, "আপনাকে সেখানে নামিয়ে দিয়ে আমরা নিজের জগতে ফিরব তাড়াতাড়ি। কারণ আমাদের বিমানে তেল ফুরিয়ে আসছে।"

"ফিরবেন ত নিশ্চয়ই। কিন্তু আসতে হবে আবার"—বললেন থিওডোর—"আপনার ভিতর দিয়ে আমি জন্মভূমির সঙ্গে যোগসূত্র দেখতে চাই।"

"আমি আসতে পারি বা না পারি, ওভার্লি আসবে নিশ্চয়ই"—হাসিমুখে বলল টারজান—"ওর ভিতর দিয়ে ত বৈবাহিক সূত্রই স্থাপিত হচ্ছে দুই জগতের মধ্যে! কী বল ওভার্লি? কী বল নোরা?"

ওভার্লি আর নোরা মাথা নীচু করল লজ্জায়।

—শেষ—

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

৭

বিশ্বজিৎ ওরফে সঞ্জয়ের চিন্তাধারা কখন কোন্ খাতে বইছে, এইবার তা নিয়ে একটু গবেষণা করলে দোষ কী ?

প্লেন থেকে আদ্দিস আবাবায় সে নামল যখন, হঠাৎ কোন হোটেলে গিয়ে সে উঠল না। মালপত্র এয়ারপোর্টেই জমা রেখে সারাটা দিন ঘুরে বেড়াল শহরের বস্তি অঞ্চলগুলিতে। নিজে গোয়েন্দা মানুষ, মানুষের চোখের দিকে চাইলেই ধরতে পারে কোন্ লোকটা সাচ্চা, কোন্টা তা নয়। প্রতি বস্তিতেই এমন লোক ডজনে ডজনে সে দেখতে পেল, যাদের মুখের রেখায় রেখায় অদৃশ্য হরফে লেখা আছে—"এই একটা আস্ত শয়তান।" যেখানে যায়, তেমনি লোক দুই একটাকে সে ডেকে নিয়ে যায় নিরিবিলিতে। প্রথমেই হাতে গুঁজে দেয় একটা ডলার, তারপরে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করে—"রাস মোজাফ্-ফারকে কোথায় পাব বলতে পার ? দেখছই তো আমি বিদেশী লোক, আমার দ্বারায় রাসের কোন ক্ষতি হওয়া সম্ভব নয়। উলটে রাসের দ্বারা আমার উপকার হতে পারে যথেষ্ট।"

তাড়া খেল, গালি-গালাজ শুনতে হল অনেক জায়গায়। একটা লোক সড়াক করে ছোরাই বের করে ফেলল একখানা।

কিন্তু কিছুতেই দমল না সঞ্জয়। রাসকে দরকার তার। মর্মান্তিক দরকার। আর দরকার যেখানে মর্মান্তিক হয়, সেখানে কি আর ছোরার ভয় করলে চলে ?

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, সঞ্জয় হল সুদূর পশ্চিম বাংলার লোক, আবিসীনিয়ার ডাকাত মজাফ্ফারের নাম সে জানল কী করে ?

এ-প্রশ্নের উত্তর হল এই যে, সুদূর বাংলায় বসে আবিসীনিয়ার দস্যু মজাফ্ফারের নাম যে

শুনেছে সঞ্জয়, তা শুধু এই কারণে যে, সঞ্জয় পুলিস এবং মজাফ্‌ফার আন্তর্জাতিক স্তরের কুখ্যাত দস্যু। উঁচু দরের ডাকাত, ঘাতক, জালিয়াৎদের নাম তাদের স্বদেশের গণ্ডিতেই আবদ্ধ থাকে না বেশী দিন, স্বদেশের পুলিসই দুনিয়ার সর্বদেশে তাদের নামধাম, বিবরণ পাঠিয়ে দেয়, ফটো সমেত। উদ্দেশ্য, ভিনদেশী পুলিসকে ওয়াকিবহাল করে রাখা এই কীর্তিমানদের সম্পর্কে। নিজের দেশে বড় বেশী তাড়া খেলে ওরা দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবারও নিঃসঙ্কোচে লঙ্ঘন করে চলে যায় কিনা! ইউরোপের ডাকাত আমেরিকায়, আমেরিকার ডাকাত চীন সমুদ্রে তো হামেসাই আবির্ভূত হচ্ছে খুনোখুনি লুঠতরাজের নয়া নয়া খেল দেখাবার জন্য।

সেই জন্যই চালু হয়েছে এই প্রথাটা। এক দেশের নাম-করা অপরাধীর সচিত্র ইতিহাস অন্য দেশে সরবরাহ করা। সেই সূত্রেই রাস মজাফ্‌ফারের কথা জানা ছিল পশ্চিমবঙ্গের গোয়েন্দা বিশ্বজিতের। সঞ্জয়রূপে সেই জ্ঞানটুকুই এখন কাজে লাগাতে চাইছে বিশ্বজিৎ।

চেষ্টা তার বিফল হল না। সারা রাত্রি বস্তি-পরিক্রমার পরে ভোর ভোর সময়ে একটা কাফ্‌রি ছোকরার দেখা পেল সঞ্জয়। ছোকরাটা বিনা বাক্যে তার হাত ধরে টেনে নিয়ে তুলল একটা কফির দোকানে। রাস মোজাফ্‌ফার সেখানে শাহানশাহী মর্যাদায় সমাসীন, ধূমায়মান কফি সমুখে নিয়ে। চোস্ত ইংরেজীতে সে আমন্ত্রণ জানাল—"আসুন, আসুন, অনেক ঘুরেছেন শুনলাম, এক পেয়ালা কফি খান—"

আলাপ-সালাপ, প্রস্তাবনা-আলোচনা, পরিশেষে একটা বন্দোবস্ত। মজাফ্‌ফারের চেনা-জানা এক নামহীন হোটেলে কয়েকদিন কাটাল সঞ্জয়। তারপর কার্ড দিয়ে এল অ্যালায়ান্স হোটেলে,

—"আসুন, আসুন, অনেক ঘুরেছেন শুনলাম, এক পেয়ালা কফি খান—"

তারও পরে সন্ধ্যায় গিয়ে দেখা দিল সেখানে মজাফ্‌ফার সমেত।

দুই মিনিটের মধ্যে ওরা অজ্ঞান করে ফেলল রাহুল, শতানীককে। তারপরে দুটো ঘরে তল্লাশী শুরু করল দুজন। কিন্তু ঝঞ্ঝাট! ঐ অভাগা মোবারকটা কী ফ্যাসাদই যে বাধিয়ে দিল! সবে ওরা খাট থেকে বিছানা টেনে নামিয়েছে, এমন সময়ে দমাদ্দম ঘা পড়ল দরোজায়, বাইরে হুমকি —"ভাঙ্গো দরোজা!"

সর্বনাশ! টের পেয়ে গেল? কী করে পেল? কিন্তু চিন্তার সময় এটা নয়। টের যে পেয়ে গেছে, তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। না যদি পেত, সরাসরি দরোজা ভেঙ্গে ফেলার হুকুম তাহলে দিত না ওরা।

কে দিল হুকুমটা? রোসো, রাস মোজাফ্ফার তাকে দেখে নেবে। কিন্তু সে পরের কথা। এখনকার কাজ হল পালানো।

তার আগে—খাট বাক্সো দুটো—

এদেশে খাটের ভিতর বাক্সো থাকে। দামী জিনিস লুকোবার নিরাপদ জায়গা। পাটাতনের নীচে ওরই সঙ্গে গাঁথা একটা বাক্সো। তার ডালার উপর দিকটা এমন মসৃণভাবে মেশানো থাকে পাটাতনের সঙ্গে যে, সহসা ঠাউরে সেটা বার করা সহজ নয়। চাবির ফোকর অতি সরু। তাও চোখে পড়া শক্ত।

চাবি অবশ্য সেন-চৌধুরীর কাছেই আছে। কিন্তু কোথায় তারা রেখেছে, ঠিক কী তার? জামার পকেটে থাকতে পারে, প্যান্টের পকেটে থাকতে পারে, জুতোর সুকতলার নীচে থাকারও আটক নেই। এসব ছাড়াও অন্য জায়গায় ওরা তা লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা অনায়াসেই করে থাকতে পারে। খুঁজে দেখার মত সময় ত হাতে নেই দস্যুদের। সময় বা সুযোগ থাকবে কি থাকবে না, নিশ্চয়তা নেই যেখানে, পাকা ডাকাতেরা সেখানে নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা করেই নিয়ে আসে। মোজাফ্ফার "মাস্টার কী" নিয়ে এসেছে। সব-খোল্ চাবি, যে-চাবি খাট-বাক্সোর যে কোন তালায় লাগবে। একটা নয়, দুটো। নিজে একটা রেখেছে, সঞ্জয়কে একটা দিয়েছে। অভাগা কী করে জানবে যে চাবি নয়, নিজের মৃত্যুবাণই সে তুলে দিচ্ছে এই অপরিচিত ভিন্‌দেশীর হাতে?

সেই চাবি দিয়ে দুই ঘরেরই খাট-বাক্সো ওরা যুগপৎ খুলে ফেলেছে এক এক মোচড়ে। মোজাফ্ফার যেটা খুলেছে তার ভিতরটা বিলকুল ফাঁকা, কিছুমাত্র নেই তাতে। কিন্তু সঞ্জয় যে শতানীকের খাটবাক্সে কিছু-না-কিছু পেয়ে গিয়েছে, তা তার চাপা গলার জয়োল্লাসেই প্রকাশ পেয়ে গেল। "থ্যাঙ্ক গড" জাতীয় একটা সার্থকতাসূচক অব্যয় তার অজান্তেই বেরিয়ে পড়ল মুখ থেকে।

মোজাফ্ফার তা শুনেছে, সে লাফিয়ে এসে পড়ল সাথীর কাছে—"দেখি! দেখি! কী জিনিস?"

সঞ্জয় জামার ভিতরকার সুপরিসর পকেটে তখন ঢুকিয়ে ফেলেছে একটা প্যাকেট—"পরে! পরে! আগে বেরুবার উপায় কর। দরোজা ভাঙ্গল ঐ।"

কথাটা সত্যি। আর দেরি করলে পালানো যাবে না। "ঐ জানালা!" আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল রাস। হোটেলের শোবার ঘর মাত্রেই ফরাসী জানালা, এতে গরাদ থাকে না। ভিতর দিকে অবশ্য ছিটকিনি বন্ধ ছিল। মোজাফ্ফার এক লাফে গিয়ে তা খুলে ফেলল, এক সেকেণ্ডের মধ্যে লাফিয়েও পড়ল নীচে তাই দিয়ে। সঞ্জয়ও দিল লাফ তার পিছু পিছু, যদিও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে দোতলা থেকে হুট করে লাফিয়ে নামতে তার যথেষ্ট দ্বিধা হত।

মোজাফ্ফার আগে নেমেছে, আগেই দৌড়োচ্ছে। তাকে অতিক্রম করে আগে যাওয়ার চেষ্টা একবারও করেনি সঞ্জয়। একে মোজাফ্ফার পথ চেনে। সব হোটেলের আগম-নিগমের সব পথই যে তার নখদর্পণে, সেকথা আগেই সে বড়াই করে বলেছে সঞ্জয়কে। চেনে যখন, পথ দেখাক ও। দ্বিতীয়তঃ, প্যাকেটটা পকেটে পোরার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়াবহ চিন্তা তার মগজে এসে বল্লমের ফলার মত খোঁচা দিয়েছে এবং গেঁথেই রয়েছে সেইখানে। সেটা হল এই যে এ-প্যাকেট সে কোনমতেই দেবে না মোজাফ্ফারের হাতে, দেবে না প্রাণ গেলেও।

প্যাকেট? অবশ্যই নকুল চৌধুরী কথিত সেই তেরোশো বছরের সম্পদের ঠিকানা আছে এই প্যাকেটের মধ্যে। সে সম্পদটা যে কী জিনিস,

তা অবশ্য এখনো জানে না সঞ্জয়। কিন্তু তাতে কী? সেটা যে তুচ্ছ করবার মত বস্তু নয়, তা ত পাগলেও বোঝে। তুচ্ছই যদি হবে, তাহলে কি এই রাহুলেরা কাজকর্ম বন্ধ করে, অজস্র পয়সা খরচ করে অন্ধ আফ্রিকায় ছুটে আসে তারই সন্ধানে? না, তুচ্ছ কখনোই নয়। হয়ত একটা রত্নভাণ্ডার। হয়ত একটা—

মরুক সে। অত উপমা খুঁজবার সময় কই এখন? দরকারই বা কী? এক কথায়, এমনই জিনিস এটা যে দুটো বুদ্ধিমান বাঙ্গালী এর জন্য জীবনপণ করতেও কাতর হয়নি।

ওরা যখন হয়নি, তখন সঞ্জয়ই বা হবে কেন কাতর? যাতে জীবন যেতে পারে পরিণামে, এমন একটা দুঃসাহসের কাজ এক্ষুণি করবে সঞ্জয়। যাতে ঐ তেরোশো বছরের সম্পদের একটা মোটা বখরা না দিতে হয় এই বিদেশী দস্যু মোজাফ্‌ফারকে। লোক অতি সাংঘাতিক এই মোজাফ্‌ফার। এক্ষুণি যদি ওকে পথ থেকে সরিয়ে ফেলা না যায়, শেষ পর্যন্ত বখরাতেও খুশী হবে না, টান দেবে গোটা সম্পদটা নিয়েই। সঞ্জয়ের হবে শুধু কাদা মাখাই সার। না না, অপেক্ষা করা কিছু নয়, দ্বিধা করার মানে নিজের পায়ে কুড়োল মারা। সঞ্জয় বোকাও নয়, দুর্বলচিত্তও নয়। সময় থাকতে পথের কাঁটা সে সরাবে।

বাগানের সীমানায় ছয় ফুট পাকা দেয়াল। অমন ভারী লাশ ঐ রাস মোজাফ্‌ফারটা, তড়তড় করে তার উপরে উঠে গেল কাঠবেড়ালের মত। তার চেয়ে অনেক হালকা দেহ নিয়েও সঞ্জয় কিন্তু পা হড়কে পড়ে যাচ্ছে বারবার। এটা বোধহয় আশঙ্কাই করেছিল রাস, তা নইলে দেয়ালের মাথায় সে বসে আছে কেন, লাফিয়ে ওপিঠে না পড়ে?

পড়ত, যদি লুঠের মালটা তার নিজের পকেটে থাকত, সঞ্জয়ের পকেটে না থেকে। এখন পরিস্থিতি যা, তাতে সঞ্জয় যাতে ধরা না পড়ে যায়, তা অবশ্যকরণীয় মোজাফ্‌ফারের পক্ষে। হতভাগা ইণ্ডিয়ান এক্ষুণি যদি হাতে-নাতে গ্রেফতার হয়, রাস বেচারীর সব মেহনতই ত মাঠে মারা গেল!

কিছুতেই সঞ্জয় উঠতে পারছে না। ওদিকে হোটেলের লোকজন নেমে পড়ছে ফরাসী জানালা দিয়ে। বাগান পেরুতে আর কতক্ষণ তাদের? রাস তাই এমন একটি কর্ম করল, যা ইতিপূর্বে কোন সহকর্মীর জন্য সে করে নি। ঝুঁকে পড়ে হাত ধরে টেনে তুলল সঞ্জয়কে। তুলেই নিজে ওপিঠে পড়ল লাফিয়ে। সঞ্জয়ও করল না দেরি। সেও লাফিয়ে পড়ল এবং পড়ল একেবারে রাস মোজাফ্‌ফারের পিঠে। সেটা কি ইচ্ছাকৃত? না, দৈবঘটিত?

যাই হোক, এই তার সুযোগ। এ সুযোগ সে হারাবে না। রাস উঠে দাঁড়িয়েছিল, পিঠের উপর সঞ্জয় এসে পড়ল বলে আবার তাকে নিতে হল ধরাশয্যা। আর সেই শয্যাই হল তার অন্তিম-শয্যা। পড়া মাত্র সঞ্জয়ের ছোরা রাসের পিঠ দিয়ে ঢুকে বুক দিয়ে ফুঁড়ে বেরুল।

মোজাফ্‌ফারেরই চেনাজানা এক হোটেলে সে ডেরা নিয়েছিল। সেইখানেই সে গেল অতঃপর। রাস সাহেবের দোস্ত সে, অসামান্য খাতির হোটেলে। জামাকাপড়ে রক্তের দাগ বিলক্ষণ রয়েছে তার, কেউ তা তাকিয়ে দেখল না। রাসের দোস্ত যারা, রক্ত ত তাদের খেলার জিনিস! যদি তারা জানত যে এ রক্ত কার? আজ রাতে তা ওদের জানবার সম্ভাবনা নেই। আর আজ রাতেই এখানকার ডেরা তুলবে সঞ্জয়।

দুরু দুরু বক্ষে নিজের ঘরে গিয়ে দোরে আগল তুলে দিল সঞ্জয়। রক্তটক্ত পরে ধুলেও চলবে। প্রথম কাজ হল পকেট থেকে প্যাকেটটা নিয়ে—

হা হাতোস্মি! এ কী?

হা হতোস্মি! এ কী? খানকতক সাদা কাগজ পরিপাটি করে ভাঁজ করা। লেফাফায় পুরে বেশ মোটাসোটা কলেবরের একটি প্যাকেট করে রেখেছে ঐ ঠগ দুটো, রাহুল চৌধুরী আর শতানীক সেন। কেন? কেন? অবশ্যই সম্ভাব্য দস্যুতস্করদের বোকা বানাবার জন্য। ওঃ, ধূর্তামির ত অন্ত নেই ওদের!

আর এদিকে দেখ, এই সাদা কাগজগুলোর জন্য একটা নরহত্যা করে বসলে সঞ্জয় সিকদার। পুলিস অতঃপর খুঁজতে থাকবে সঞ্জয় সিকদারকে, কারণ নিজের নাম-লেখা কার্ড ত সে নিজেই রেখে এসেছিল অ্যালায়ান্স হোটেলে। তাকে সনাক্ত করার লোকও রয়েছে ওখানে। র‍্যাফেলিনোর হাতে কার্ড দিয়েছিল। সন্ধ্যাবেলায় তাকে আর রাসকে উপরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল র‍্যাফেলিনোর সহকারী। দু দুটো লোক দেখেছে ওকে।

হ্যাঁ, পুলিস খুঁজবে তাকে। সে পুলিসের হাত থেকে তাকে সাময়িকভাবে বাঁচাতে পারত যে লোক, সে হল ঐ রাস মোজাফ্ফারই। কিন্তু সেই রাসকেই সে—

হ্যাঁ, রাসকে হত্যা করা চূড়ান্ত হঠকারিতা হয়েছে তার। যে ছিল তার একমাত্র সহায় এই বিদেশে বিভূঁইয়ে, তাকেই সে নিজের হাতে—

সেই হাত দিয়েই নিজের গালে ঠাস ঠাস করে চড়াতে লাগল সঞ্জয়। তারপর ঝিম ধরে বসে রইল প্রায় আধ ঘণ্টা। তারপর হঠাৎ উঠল চমকে। দরোজায় বেল টিপল কে? পুলিস না কি?

রক্ষা হোক! পুলিস নয়, ওয়েটার। জানতে চায়, সায়েব ডাইনিং রুমে গিয়ে খাবেন, না তাঁর খাবার ঘরেই পাঠানো হবে।

তাইত! ডিনারের ঘণ্টা পড়েনি এখনো। অর্থাৎ রাত নয়টাই বাজেনি। অথচ সঞ্জয়ের মনে হচ্ছিল—রাত বুঝি শেষ হয়ে এল।

কা করে হবে? ঠিক সন্ধ্যাবেলাটাতেই ত অ্যালায়ান্সে হানা দিয়েছিল সে আর মোজাফ্ফার। হেসে বলেছিল রাস—"বেশী রাতে কাজকারবার করে সিঁধেল চোরেরা। আমার কাজ সব বেলাবেলি বেরাদার। রাতটা হল খানিকটা ফুর্তির, খানিকটা ঘুমের জন্য। তা ছাড়া, বেশী রাতের অতিথিকে সেনচৌধুরীরা সহজে ঘরে ঢুকতেই বা দেবে কেন? সন্ধ্যেটা হতে হতেই যাও যদি, দেখবে সব দোরই খোলা তোমার সমুখে।"

ভাবছে এইসব, ইতিমধ্যে তার খাবার ঘরে এসে গেল। খাবার রুচি থাকবে কোথা থেকে? সন্ত

একটা খুন করে এসেছে সঞ্জয়। পেশাদার খুনে চেহারা ও নয়। থেকে থেকে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে, সেটা ভয়ে। থেকে থেকে গা গুলিয়ে উঠছে, সেটা ঘেন্নায়। গলগল করে সেই যে রক্ত বেরুচ্ছিল রাসের দেহ থেকে, সেটা মনে পড়লেই বমি আসছে এখন।

কোনরকমে কিছু খেয়ে নিয়ে জামাটামা বদলে ফেলল সঞ্জয়। ঘরে তালা বন্ধ করল। রাত্রি যাপন এখানে সে করবে না। কে বলতে পারে যে কাল সকালেই, তার ঘুম ভাঙার আগেই পুলিস এসে পড়বে না এখানে? না না, না, চলো মুসাফের, বাঁধো গাটরিয়া, বহুদূর যানে হোবে গা! দূর! বহুদূর! তবে কিন্তু এই শহরের ভিতরেই থাকা চাই। প্রথম চেষ্টা বিফল হয়েছে, তা বলে হাল ছাড়লে ত হবে না! রাহুল চৌধুরীর সেই তেরোশো বছরের সম্পদ ত এ-শহর থেকে বাইরে যেতে পারেনি এখনো! পেতেই হবে তা। জীবনপণ সঞ্জয় সিকদারের, সে বস্তু পেতেই হবে তাকে।

দিশেহারার মত সে ঘুরছে। দিন চারেক সে আছে আদ্দিস আবাবায়, দু-পাঁচটা হোটেল রেস্তোরাঁ চিনে ফেলেছে এর মধ্যে। মানুষের কেমন স্বভাব, অনির্দেশ্যভাবে ঘুরতে থাকলে চেনা জায়গাগুলোর দিকেই পা তাকে টেনে নিয়ে যায় তার অজান্তেই। সেইভাবেই সে এসে এক সময় হোটেল গুলিস্তাঁর সামনে দাঁড়াল। রাত সাড়ে দশটার মত, এখনও কিছু কিছু অতিথি সে হোটেলে ঢুকছে বা তা থেকে বেরুচ্ছে। সঞ্জয় ভাবছে, সেও ভিতরে গিয়ে কড়া কফি এক কাপ খেয়ে আসবে। আবহাওয়ায় শৈত নেই, তা ঠিক, কিন্তু তার শিরায় শিরায় রক্তটাই যেন কেমন ঠাণ্ডা মেরে যেতে চাইছে। রাস মোজাফ্ফারের গরম রক্তের কথা মনে পড়লেই।

ঢুকে চারিদিক তাকাচ্ছে একটা নিরিবিলি টেবিলের সন্ধানে। কে একজন ডাকল তাকে। "মিস্টার সিকদার যে! আসুন, আমার টেবিলে চলে আসুন!" সঞ্জয় সেদিকে তাকিয়ে দেখে, এম্‌ব্যাসির চিদাম্বরম্ আপ্তে। এম্‌ব্যাসিতে যেতেই হয় প্রত্যেক বিদেশী আগন্তুককে। সঞ্জয়ও গিয়েছিল, আলাপ-সালাপও করেছিল দুই চারজন ভারতীয়ের সঙ্গে। চিদাম্বরমের সঙ্গে একটু বেশী পরিমাণে, কারণ লোক ঐ চিদাম্বরম খুব মিশুক।

"শহরের কিছুই চেনেন না, অথচ এত রাতে পথে বেরিয়েছেন যে বড়? গুণ্ডাফুণ্ডা আছে। ছিনতাই, রাহাজানি, খুন পর্যন্ত হামেসাই হচ্ছে। রাস মোজাফ্ফারের নাম ত সারা দুনিয়ায় পুলিসের জপমালা।"

কী গ্রহ! ঐ নামটাই এখানেও শুনতে হল? একটা ঢোঁক গিলল সঞ্জয়, তারপরই সামলে নিয়ে বলল—"ভারী মুশকিলে পড়া গেছে মিস্টার আপ্তে! হোটেলে আমার পাশের কামরায় একটা স্মল পক্স কেস হয়েছে। এমন বিশ্রী লাগছে সেখানে ফিরে যেতে—"

চিদাম্বরম্ সাদাসিধে মানুষ, মনটা ভাল। নিজের দেশের লোকের এমন বিপদের কথা শুনে এতই বিচলিত হল যে তার হোটেলটার নাম পর্যন্ত করল না জিজ্ঞাসা। কথা শেষ করতেও দিল না সঞ্জয়কে। সবেগে মাথা নেড়ে বলল—"যাবেন না, খবরদার, যাবেন না। মারা পড়বেন নির্ঘাৎ। আপনি আমার সঙ্গে চলে আসুন। একটা বাড়তি ঘর আমার অ্যাপার্টমেণ্টে আছে—মানে ওয়াইফ দেশে গেলেন কিনা।"

বিনা ওজরে আমন্ত্রণটা লুফে নিল সঞ্জয়।

চিদাম্বরমের বসবার ঘরে গিয়ে অতঃপর ওরা দুজনে বসল—এক বোতল পানীয় আর দুটো গেলাস নিয়ে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রাহুল শতানীকদের কথাই সাত কাহন করে জিজ্ঞাসা করতে লাগল সঞ্জয়। তারাও ত নিশ্চয়ই গিয়েছিল এম্‌ব্যাসিতে। সম্ভবতঃ এখনও যাচ্ছে।

অতিরিক্ত পান ভোজনের ফলে চিদাম্বরম্ একটু বে-এক্তেয়ার, সতর্কতা বাকসংযম হারিয়ে বসে আছে। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল—"যাচ্ছে না? সুব্বারাওয়ের হাতে গোপনে একটা মূল্যবান দলিল তুলে দিল সেদিন—আমি যে আড়াল থেকে দেখলাম, তা ত জানে না!"

মূল্যবান দলিল? এম্ব্যাসিতে?

তারপর সারা রাত ধরে সঞ্জয় লোভানি দিতে থাকল চিদাম্বরম্‌কে। কী যে রাহুলের তেরোশো বছরের পৈতৃক সম্পদ, কিছুমাত্র না জেনেও নবলব্ধ বন্ধুকে সে বোঝাতে লাগল যে, দলিল নামে যা সুব্বারাওয়ের হাতে তুলে দিয়েছে রাহুলেরা, তা আসলে কোহিনুরের চেয়ে দামী দুর্লভ মানিক একখানা, একটা আস্ত রাজ্য, যা দিয়ে অক্লেশে কিনে নেওয়া যায়।

লোভী! লোভের বশে কী না করে লোকে? ভদ্রসন্তান, মোটামুটি চরিত্রবান চিদাম্বরম্ ধীরে ধীরে বঁড়শি গিলল সঞ্জয়ের। হ্যাঁ, সরাবে সে ঐ সাত রাজার ধন মানিক এম্ব্যাসির লকার থেকে। তারপর সঞ্জয় ভাইয়ের সঙ্গে মিলে মিশে—

কিন্তু মেলামেশার সাধু সংকল্প তার কর্পূরের মত উবে গেল পরদিন। রাস মোজাফ্‌ফার খুন হয়েছে। পুলিস সঞ্জয়কেই সাব্যস্ত করেছে হত্যাকারী বলে। তবে? সঞ্জয় শেষকালে চিদাম্বরম্‌কেও পাঠাবে নাকি মোজাফ্‌ফারের পথে? সতর্ক! তাহলে ত সতর্ক হতে হবে চিদাম্বরম্‌কে! দাঁড়াও সঞ্জয় সিকদার! তোমার স্বরূপ যখন জানতে পারা গেছে, লকার থেকে জিনিসটা সরাবার পরে চিদাম্বরম্ তোমাকে দেখিয়ে দেবে কত ধানে কত চাল। (ক্রমশঃ)

টমাস আল্‌ভা এডিসন

এডিসনের জন্ম হয় ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে, যুক্তরাষ্ট্রের অন্তঃপাতী ওহিওর মিলান শহরে। বিদ্যালয়ে পড়াশুনা বেশীদিন বা নিয়মিতভাবে করেননি, যা কিছু শিখেছিলেন, তা বাড়িতে মায়ের কাছে। তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল নানারকম যন্ত্রপাতি নিয়ে নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষার উপরে।

পনেরো বৎসর বয়স যখন, তখনই স্বাধীনভাবে যন্ত্রবিজ্ঞানের চর্চা শুরু করে দিয়েছিলেন এডিসন। জীবনে অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজারটা বিষয়ে গবেষণা চালিয়েছিলেন তিনি এবং হাজারটারও বেশী নতুন যন্ত্রের পেটেণ্ট নিয়েছিলেন। তার মধ্যে ফনোগ্রাফ, বৈদ্যুতিক বাল্‌ব্, কিনেটোস্কোপ (যা থেকে পরবর্তীকালে সিনেমার উদ্ভব হল) প্রভৃতির নাম প্রথমেই করতে হয়। মানবসভ্যতার দিক-চিহ্ন হিসাবে এগুলি চিরদিন গণ্য হবে।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অনুরোধে বিবিধ রাসায়নিক পদার্থের বিকল্প উদ্ভাবন এবং নতুন নতুন মারণাস্ত্র গঠনের পথপ্রদর্শন করেন এডিসন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোক নানারকম আদরের নাম দিয়েছেন তাঁকে—"সেণ্ট মেনলোর জাদুকর", "চোখে যার ঘুম নেই" ইত্যাদি।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে এই অদ্ভুতকর্মা আবিষ্কারকের মৃত্যু হয়।

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

পাণ্ডব গোয়েন্দারা ঠিক করল এবার বড়দিনের ছুটিতে ওরা পুরী বেড়াতে যাবে। বাচ্চু-বিচ্ছুদের বাড়িতে বসে এই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। সমস্যা হল পঞ্চুকে নিয়ে। বাবলু, বিলু, ভোম্বল ও বাচ্চু-বিচ্ছু তো স্টুডেণ্ট কনসেশনে যাবে। কিন্তু পঞ্চুকে নিয়ে কি করা যায়?

ভোম্বল বলল—কি আবার, ডব্লু টি।

বাবলু বলল—তোর ঐ সব বদমায়েশি বুদ্ধি-গুলো রাখ তো।

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল—পঞ্চুর জন্য চিন্তা কি? ওর একটা আলাদা টিকিট কেটে নিলেই হবে।

বিলু বলল—অত সস্তা নয়। যাত্রীগাড়িতে পঞ্চুকে উঠতেই দেবে না।

বাবলু বলল—ঐটাই তো একমাত্র সমস্যা। তবে ও সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এখন এসপ্ল্যানেডে গিয়ে পুরী এক্সপ্রেসের থ্রি-টায়ারে রিজার্ভেশনটা করিয়ে আসতে পারলে বাঁচি।

বাচ্চু বলল—কনসেশনটা দেখিয়ে বাবা হাওড়া স্টেশন থেকে ছাপটাপ মেরে এনেছেন। এখন গিয়ে যেদিনের টিকিট পাবে সেইদিনেরই নিয়ে নেবে।

বাবলু কনসেশনের কাগজটা পকেটে রেখে বিলুকে বলল—তুই তাহলে আমার সঙ্গে আয়।

বাচ্চু-বিচ্ছুর মা বসে বসে একটা উলেনের সোয়েটার বুনছিলেন। বললেন—তোমরা সবাই যাও না কেন? তাহলে সবাই সবাইয়ের দিকে নজর রাখতে পারবে। নাহলে যেরকম দিনকাল পড়েছে তাতে অত টাকাকড়ি নিয়ে দুজনের যাওয়া কি ঠিক হবে?

বাবলু বলল—আমি তো একাই একশো কাকীমা।

—তা হোক। তবু দল বেঁধেই যাও।

—বেশ, আপনি যখন বলছেন তখন দল বেঁধেই যাই।

বাচ্চু-বিচ্ছুর তৈরি হয়ে নিতে বেশী সময় লাগল না। পাঁচজনের পুরো গ্যাঙটাই চলল এসপ্ল্যানেডে। সঙ্গে পঞ্চুও চলল।

অফিস টাইম, বাসে এখন দারুণ ভিড়। তাই ওরা লঞ্চেই পার হবে ঠিক করল। কিন্তু যারস্তুর রোডে আসতেই ওরা দেখল কাতারে কাতারে লোক লাইনে দাঁড়িয়ে আছে।

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল—ওরে বাবা। এত বড় লাইন শেষ হবে কখন?

বাবলু বলল—বেশী সময় লাগবে না। লাইন এখুনি এগিয়ে যাবে।

ওরা সবাই গিয়ে লাইনে দাঁড়াল।

ওদের সামনে দুজন অফিস যাত্রী মেয়ে দাঁড়িয়েছিল। একজনের হাতে রেক্সিন বাইণ্ডিং একটি বড় খাতা। তাইতে নাম লেখা ছিল শর্মিলা সরকার। বাবলু বিলুদের সঙ্গে পঞ্চুকেও লাইন দিতে দেখে হেসে উঠল তারা। বলল—ওমা! কুকুরটা কেমন লাইনে দাঁড়িয়েছে দেখ। তারপর বাবলুকে বলল—তোমাদের পোষা কুকুর নাকি ভাই?

—হ্যাঁ।

—ওকে লঞ্চে উঠতে দেবে?

—আমাদের সবাই চেনে। লঞ্চের ছাদে উঠে যাবে ও। কেউ কিচ্ছু বলবে না।

—কামড়ায় না তো কাউকে?

—না।

এক ভদ্রলোক লাইনে দাঁড়িয়ে একটু বিরক্তির সঙ্গে বললেন—এই অফিস টাইম ছাড়া কি তোমরা ঘর থেকে বেরোতে পার না?

বিলু বলল—এখন এগারোটা বাজে। অফিস টাইম পার হয়ে গেছে। আপনি দেরি করে অফিস যাবেন, তার জন্যে কি আমরা দায়ী?

লাইন একটু একটু করে এগোচ্ছে তখন।

বাবলুর সামনে যে মেয়ে দুটি দাঁড়িয়েছিল তাদের একজন বলল—তোমরা কুকুর নিয়ে ওপারে কোথায় যাবে? ইডেনে?

—উহুঁ। আমরা পুরী যাব। তাই টিকিট কাটতে যাচ্ছি এসপ্ল্যানেড বুকিং অফিসে।

—সেকি! তোমরা পারবে টিকিট কাটতে?

—কেন পারব না? সব কিছু পারি আমরা। আমরা হচ্ছি গোপাল ব্যানার্জী লেনের ছেলে।

—তাই নাকি? তোমাদের মুখগুলো তাই চেনা চেনা লাগছে।

—আমরাও আপনাদের চিনি। আপনারা শিবপুরের দিকে থাকেন। আমরা রামকৃষ্ণপুর ব্যায়াম সমিতি, পল্লীর মাঠ, শিবপুর গুঞ্জনের দিকে বেড়াতে যাই। আপনাদের অনেকবার দেখেছি। শুধু তাই নয়, আপনার নামও বলে দিতে পারি। আপনার নাম শর্মিলা সরকার।

মেয়েটি আশ্চর্য হয়ে চোখ দুটি বড় বড় করে বলল—আরে! আমার নাম জানলে কেমন করে?

বাবলু হেসে বলল—কেন আপনার খাতাতেই তো লেখা রয়েছে আপনার নাম। দিব্যি দেখতে পাচ্ছি।

মেয়েটি এবার বাবলুর পিঠ চাপড়ে বলল—নাঃ। তুমি দেখছি বড় হয়ে ডিটেকটিভ হবে। অত্যন্ত ব্রেনি ছেলে তুমি।

লাইন এগিয়ে তখন জেটিতে ঠেকেছে। ওপার থেকে উমেশ লঞ্চটা এলো। এরা সকলে হৈ হৈ করে ঢুকে পড়ল ভেতরে। লঞ্চের মাথায় সাইকেল চাপানো হচ্ছে দেখে পঞ্চুও লঞ্চের পিছন দিক দিয়ে ভেতরে ঢুকে এলো।

লঞ্চ যখন মাঝ গঙ্গায় তখন হঠাৎ পঞ্চু গোঁ গোঁ করে উঠল।

একজন লোক এক পাশে বসে রান্নার

আয়োজন করছিল। এতক্ষণ সে লক্ষ্য করেনি পঞ্চুকে। এবার ওর গোঁ গোঁ শব্দ শুনেই চেঁচিয়ে উঠল—এই মরেছে। এই নেড়ি কুত্তাটা কোত্থেকে ঢুকে এল রে ?

বাচ্চু-বিচ্ছু সঙ্গে সঙ্গে লোকটাকে বলল—এটা আমাদের পোষা কুকুর। একে নেড়ি কুত্তা বলবেন না।

বাবলু পঞ্চুর কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল—কিরে, অমন গোঁ গোঁ করছিস কেন ?

পঞ্চু বার বার একটা তক্তার খোলের নীচে তাকাতে লাগল।

বাবলু সেদিকে এগোতেই লঞ্চের একজন লোক ধমকে উঠল তাকে—এই খোকা, ওখানে কি করতে যাচ্ছ ?

বাবলু তার কথায় উত্তর না দিয়ে সেখানে উঁকি-ঝুঁকি মারতে লাগল। তারপর ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে কি যেন একটা তুলে নিল। সেটার সঙ্গে টিনের একটা বাক্সও ছিল।

লোকটা বলল—এরই মধ্যে হাত সাফাইয়ের কাজ শিখে গেছ বাবা ?

লঞ্চসুদ্ধ লোক তখন অবাক্ হয়ে তাকিয়ে আছে এদের দিকে। বাবলু বলল—কথাবার্তা যা বলবেন একটু ভেবে চিন্তে বলবেন। বলে হাতের জিনিসটা লোকটার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল—জিনিসটা কি জানেন ? এটা টাইম বোমা। এটা ফাটলে গোটা লঞ্চটা উড়ে যেত।

তাই না দেখে সকলেই তো হৈ চৈ করে উঠল।

বাবলু তখন টিনের বাক্সটা খুলতেই তার ভেতর থেকে একটা চিঠি পেয়ে গেল। তাইতে লেখা আছে—রাতারাতি লঞ্চের ভাঁড়া বাড়ানোর ওষুধ। সব লঞ্চগুলোকে এইভাবেই ওড়াব। অফিস টাইম পার হলে বেলা একটার সময় পাঁচটা লঞ্চই উড়ে যাবে একসঙ্গে—জনৈক বন্ধু।

লঞ্চসুদ্ধ লোক সকলেরই চোখ কপালে উঠে গেছে তখন। সবাই এসে ধন্যবাদ জানাল ওদের—ওঃ। ভাগ্যে তোমরা ছিলে ভাই। নাহলে সব লঞ্চ নষ্ট হয়ে গেলে কাল থেকে আমাদের বাসের হাতলে ঝুলে অফিস যেতে হত। কি যে করতুম। তোমরা কারা ভাই ?

বাবলু বলল—পাণ্ডব গোয়েন্দা।

এ নাম সকলেরই চেনা। সকলেই তাই আনন্দে হৈ-চৈ করে উঠল। লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল ওদের নাম—পাণ্ডব গোয়েন্দা।

লঞ্চ ওপারে ভিড়তেই বাবলু গিয়ে পুলিসের হাতে বোমা ও সেই চিঠিটা দিয়ে সব লঞ্চগুলোকে সার্চ করে দেখতে বলল। তারপর রেডিও অফিসের পাশ দিয়ে হেঁটে হেঁটে ওরা এসপ্ল্যানেডে চলল বুকিং অফিসে টিকিট কাটতে। ভাগ্য ভালো তাই পরের দিনের টিকিটই পেয়ে গেল ওরা।

পরদিন সন্ধ্যের পরই সকলে যথাসময়ে এসে হাজির হল হাওড়া স্টেশনে। বাবলুর বাবা এসেছিলেন ওদের সী অফ করতে। ওদের ট্রেনে চাপিয়ে খুব সাবধানে চলাফেরা করবার উপদেশ দিয়ে ট্রেন না ছাড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে লাগলেন। তারপর যথাসময়ে ট্রেন নড়ে উঠতেই ওদের হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে বাবলুর বাবা চলে এলেন।

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও তখন থ্রি-টায়ার কামরায় বেশ জাঁকিয়ে বসেছে সকলে।

হাওড়া স্টেশন ছাড়তেই ঝড়ের বেগে ছুটে চলল ট্রেন।

এই প্রথম পাণ্ডব গোয়েন্দাদের দূর দেশে যাত্রা। তাই আনন্দে অধীর সকলে। একটা বড় র‍্যাশন ব্যাগে করে পঞ্চুকে নিয়ে আসা হয়েছিল গেট চেকারের নজর এড়াবার জন্য। বাবলু এবার ব্যাগটা লোয়ার বার্থের তলায় ঢুকিয়ে মুখটা খুলে

দিতেই পঞ্চু গুটি গুটি বেরিয়ে এল তার ভেতর থেকে। তারপর সেই বার্থের নীচেই কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে রইল চুপচাপ। কামরার অন্যান্য যাত্রীরা কেউ দেখতেও পেল না পঞ্চুকে।

টাকা পয়সা বাবলুদের সঙ্গেই ছিল। প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্তর রাখা স্যুটকেশটা বার্থের নীচে পঞ্চুর জিম্মায় রেখে নিশ্চিন্তে বসল ওরা।

ট্রেন যখন খড়গপুরের কাছাকাছি তখন ওরা রাতের খাওয়া সেরে নিল। লুচি, আলুর দম, সন্দেশ পেট ভরে খেল পাঁচজনে। পঞ্চুরটা বার্থের তলায় বাবলুই ঢুকিয়ে দিল। এবার শোবার পালা।

ততক্ষণে কোচ অ্যাটেণ্ডেন্টস্ এসে ওদের টিকিট পরীক্ষা করে চলে গেছেন। অনেকেই শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে। বাবলুরাও শোবার জন্য তৈরি হল।

মুখোমুখি দুটো আপার বার্থে শুয়ে পড়ল বাবলু আর বিলু! মাঝের বার্থে বাচ্চু এবং লোয়ার বার্থে বিচ্ছু। বাকী রইল ভোম্বল। তার সিট পড়েছিল এদেরই লাগোয়া সাইডের লোয়ার বার্থে। একজন ভদ্রমহিলাও ছিলেন সেই দিকে। তাঁর ছিল আপার বার্থ। ভোম্বল তাঁকে লোয়ার বার্থটা দিয়ে নিজে উঠে পড়ল আপার বার্থে। এতে ওদের খুবই সুবিধে হল। বাবলু, বিলু আর ভোম্বল আপার বার্থে মুখোমুখি শুয়ে গল্প করতে লাগল। শতরঞ্চি আর বালিশ পেতে পা থেকে গলা পর্যন্ত চাদরে ঢেকে শুয়ে রইল সকলে। ট্রেন ছুটে চলেছে রাতের অন্ধকারে ঝড়ের বেগে, কাল সকাল সাতটার মধ্যেই ওরা পৌঁছে যাবে যথাস্থানে।

রাত তখন কত তা কে জানে।

হঠাৎ কামরার মধ্যে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হল। বাবলুরা ছিল মাঝামাঝি জায়গায়। কামরার গোড়ার দিক থেকে আতঙ্কের রেশটা ছড়িয়ে পড়ল।

ডাকাত পড়েছে।

চারজন বলিষ্ঠ চেহারার লোক পাইপগান, বন্দুক, রিভলভার বার করে যাত্রীদের যথাসর্বস্ব লুট করতে শুরু করেছে। ভয়ার্ত যাত্রীরা কেউ চিৎকার করছে, কেউ অনুনয় বিনয় করছে। কিন্তু ডাকাতদের কঠিন প্রাণে এতটুকু মমতাও জাগছে না। নিষ্ঠুরভাবে তারা বলছে—আমরা অযথা রক্তপাত চাই না। যার কাছে টাকা, পয়সা, গয়নাগাঁটি যা কিছু আছে ভালোয় ভালোয় বার করে দিন। নাহলে দেখছেন তো?

ওপর থেকে বাবলুরাও দেখল। চারজন লোকই সশস্ত্র। বিলু বলল—প্রতিদিন পালা করে এইসব লাইনে এমন চুরি ডাকাতি হচ্ছে, অথচ এর কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা নেই?

বাবলু বলল—না থাক। এর প্রতিকার আমরাই করব। আমরা তো তৈরি হয়েই এসেছি। সবাই রেডি হয়ে যা। এক মুহূর্ত দেরি নয়। আসুক ব্যাটারা একবার এখানে।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই এরা কাজ শুরু করে দিল। প্রত্যেকের মাথায় বালিশের কাছে একটা করে ঝোলা ব্যাগ রাখা ছিল। তাইতে ছিল বেশ শক্তগোছের নাইলনের দড়ি। তার এক মুখে ফাঁস। যেদিকে ফাঁস তার বিপরীত দিকটা বার্থের লোহার রডের সঙ্গে বেঁধে ফাঁসটা লুকিয়ে বসে রইল ওরা। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু ও বিচ্ছু বালিশের নীচে হাত দিয়ে ইস্পাতের ধারালো ছোরাগুলো একবার দেখে নিল। বাবলুর হাতে লুকনো রইল ওর দোনলা পিস্তলটা।

ডাকাতগুলো তখন ওদিক থেকে এদিকে এসে পড়েছে।

ভোম্বলের বার্থের নীচে যে ভদ্রমহিলা শুয়ে-

ছিলেন ওরা এসে তাঁর গলার হারগাছাটির দিকে তাকাল—ওটা দিয়ে দিন।

—না। এ আমি কিছুতেই দেব না।

—দিয়ে দিন বলছি।

একজন যাত্রী ভয়ে ভয়ে মহিলাকে বললেন—দিয়ে দিন দিদি, এরা ডাকাত। এদের প্রাণে মায়াদয়া নেই। হয়তো খুন করে ফেলবে।

চারজন ডাকাতই তখন ভদ্রমহিলাকে ঘিরে ফেলেছে।

একজন বলল—অমন তাগড়া-তাগড়া জোয়ান লোকগুলো ভয়ে ভেড়ার মতো সব কিছু তুলে দিল, আর আপনি দিতে চাইছেন না? সাহস তো কম নয় আপনার?

বাবলু আর থাকতে না পেরে ওপর থেকে বলল—আসল ব্যাপারটা কি জানেন দাদা? বাঁশ বনেই ডোম কানা হয়। আপনারাও তাই আঘাটায় ফেঁসেছেন।

বাবলুর কথা শুনে ডাকাতরা ঘুরে তাকাল ওর দিকে।

একজন ততক্ষণে ভদ্রমহিলার গলার হার ছিনিয়ে নিয়েছে। বাকীরা বাবলুকে বলল—একটি ঘুষিতে তোমার মুখ ভেঙে দেব ডেঁপো ছোকরা কোথাকার।

বিলু আর ভোম্বল দুদিক থেকে বলল—আমাদের মুখগুলো কি করবেন? ফটো তুলে বাঁধিয়ে রাখবেন?

একজন বলল—তোরা কারা?

বাবলু বলল—আমরা ধূমকেতু। কেউ-কেউ যেমন ডুগডুগি বাজিয়ে বাঁদর নাচায় আমরাও তেমনি তুড়ি দিয়ে ডাকাত নাচাই। তোমরা নাচবে? টুইস্ট নাচ?

—খবরদার বলছি, মুখ সামলে কথা বলবি। তোদের ঐ ঝোলায় ভেতরে কি আছে বার কর।

ভোম্বল বলল—এই ঝোলায় করে আমরা ডাকাত ধরে নিয়ে গিয়ে বাবা জগন্নাথের কাছে বলি দেব।

একজন বলল—ছেলেগুলোর মাথা খারাপ আছে নাকি বল তো? কোথায় ভয়ে কাঁপবে তা নয় ইয়ার্কি মারছে।

বিলু বলল—না। মাথা খারাপ তোমাদের। সেইজন্যেই মনে করেছ রেলের পুলিসগুলো মরে গেলেও জনগণও বুঝি মরে গেছে। আমরা সেই জনতার প্রতিনিধি। তবে বিধান সভার সদস্য নয়। আমরা—।

—চুপ করলি কেন বল?

—না। ওস্তাদের মার শেষ রাতে। আগে তোমরা তোমাদের কাজ কর। তারপরে আমরা আমাদের কাজ করব। অনেক টাকা আছে আমাদের কাছে। আমরা বড়দিনের ছুটিতে পুরী বেড়াতে যাচ্ছি। কাজেই বুঝতে পারছ তো, শুধু হাতে যাচ্ছি না? পার তো কেড়ে নাও। তারপর খেলা দেখবে।

একজন বলল—আমরা তো টাকা নিতেই এসেছি। শীগগির বল কোথায় টাকা আছে? অযথা সময় নষ্ট করিস না আমাদের। এক্ষুণি নেমে যাব আমরা। নাহলে সামনেই বড় জংশন। ধরা পড়ে যাব।

বাবলু বলল—টাকা কড়ি আছে আমাদের ছোট্ট ভাইয়ের কাছে স্যুটকেশে।

—কোথায় তোদের ভাই?

—একেবারে বার্থের নীচে।

—বার্থের নীচে কেন?

—আরে দাদা বুঝছেন না, ডরু-টি। যদি চেকার এসে ধরে? তাই ওকে বার্থের তলায় রেখেছি। ভারী বাধ্য ছেলে। হাত বাড়ান,

পঞ্চু ঘ্যাক করে কামড়ে ধরল তার হাতটাকে।

দিয়ে দেবে। একেবারে শান্ত শিষ্ট এক চোখ কানা ল্যাজ বিশিষ্ট।

বলা মাত্রই একজন বার্থের তলায় হাত ঢোকাল।

বাবলু ওপর থেকে বলল—পঞ্চু, কুইক! এবার তোমার যথাকর্তব্য তুমি পালন করে ফ্যাল।

পঞ্চু তো এতক্ষণ ধরে এই সুযোগটারই অপেক্ষা করছিল। ডাকাতটা যেই না স্যুটকেশ নেবে বলে বার্থের তলায় হাত ঢুকিয়েছে অমনি সে ঘ্যাঁক করে কামড়ে ধরল তার হাতটাকে।

ডাকাতটা চিৎকার করে উঠল—ওরে বাবারে, গেলুম রে, আমাকে কুকুরে কামড়েছে।

কামড়ানো বলে কামড়ানো? পঞ্চু যাকে কামড়ায় তাকে কামড়ে ধরে রাখে। বাবলু না বলা পর্যন্ত ছাড়ে না।

ডাকাতটা চেঁচিয়ে উঠতেই বাকী তিনজনে ঝুঁকে পড়ল—কুকুর!

বাবলুরা তো এই সুযোগই চাইছিল। একবার শুধু চোখে চোখে ইশারা হল। তারপরই নাইলনের দড়ির সেই ফাঁস তিনটে তিনজন লোকের গলায় মালার মতো আটকে দিয়ে হেঁচকা টানে টেনে ধরল। যেমন তেমন টান নয়, একেবারে মোক্ষম টান যাকে বলে। চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে লাগল সব। সমস্ত রক্ত মুখে এসে জমাট বাঁধল বিকৃত হয়ে গেল মুখ। দুজনের হাত থেকে দুটো পাইপগান ছিটকে পড়ল মেঝেতে। একজনের হাতে বন্দুক ছিল। সেটা সে তোলবার চেষ্টা করতেই বাবলু সজোরে তার মুখে একটা লাথি মারল। বাচ্চু ছিল মাঝের বার্থে। সেখান থেকে লাফিয়ে নেমে সে কেড়ে নিল বন্দুকটা। মুহূর্তের মধ্যে যেন ম্যাজিক শুরু হয়ে গেল।

কামরাসুদ্ধু লোক যারা এতক্ষণ সর্বস্বান্ত হয়ে কান্নাকাটি করছিল তারা দলবদ্ধ হয়ে ছুটে এল। সে এক দেখবার মতো দৃশ্য।

বাবলু ডাকাতগুলোকে বলল—কিরে ব্যাটারা, আর কখনো ডাকাতি করবি? এবার দেখলি তো ওস্তাদের মার কেমন হয়?

কিন্তু কে দেবে সাড়া? তিনজনের গলা তখন এমনভাবে ফাঁসে আটকানো যে সামান্য আভ ঘেটার ক্ষমতাটুকুও তাদের নেই।

যে লোকটাকে পঞ্চু কামড়ে ধরেছিল সে বলল—দোহাই তোমাদের। আমাদের ছেড়ে দাও ভাই। আমরা সব মাল-পত্তর ফেলে রেখে চলে যাচ্ছি। আর কখনো এমন কাজ করব না।

বাবলু বলল—হ্যাঁ। ছেড়ে দেব বৈকি। নাহলে চার চারটে গাধা নিয়ে কি করব আমরা? তোমরা আমাদের কোন্ কাজে লাগবে বল?

পাঁঠা হলে নাহয় বলি দিতাম। কিন্তু তা যখন নয় তখন পুলিসের হাতে দেয়াই ভালো। কিছুদিন তবু জেলের ঘানি টানতে পারবে।

ডাকাতটার এক হাত পঙ্কু কামড়ে থাকলেও অন্য হাতটা সে গুটি গুটি পকেটে ঢোকাবার চেষ্টা করল। যেই না করা বিচ্ছু অমনি তার মাথাটা দড়াম করে ঠুকে দিল বার্থের কাঠে। সঙ্গে সঙ্গে উহু-হু করে উঠল সে।

বিচ্ছু মাথাটা ঠুকে দিয়েই বালিশের তলা থেকে ছুরিটা বার করে তার পিঠের কাছে ঠেকিয়ে ধরল।

বাচ্চু বলল—পকেটে হাত ঢোকাচ্ছ কেন? উঁ?

—ও কিছু নয়।

—কিছু নয়? কই দেখি? বলেই বাচ্চু তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে বার করে আনল একটা ৩৪৫ রিভলবার।

ধীর শ্লথ গতিতে ট্রেন এসে থামল একটা বড় স্টেশনে।

বাবলু যাত্রীদের বলল—যান। তাড়াতাড়ি পুলিসকে খবর দিন।

খবর দেয়া মাত্রই জনা কুড়ি সশস্ত্র আর. পি. এফ. হইহই করে ছুটে এল। ওদের সঙ্গে একজন ইনস্পেক্টারও এলেন। এসে এদের দেখেই বললেন—আরে, এইটুকু ছেলেমেয়েরা এই অতি ভয়ঙ্কর ডাকাতগুলোকে ধরে ফেললে? অথচ এগুলোকে ধরবার জন্য কত চেষ্টা করেছি আমরা। এক ব্যাটা আমাদের গুলিতে আগেই মরেছে। বাকী চারটেকে কিছুতেই বাগে পাচ্ছিলুম না।

বাবলু বলল—চেষ্টা আপনারা মোটেই করেননি স্যর। নাহলে পুলিসের অসাধ্য কিছু আছে? হাওড়া জেলার আমতা গ্রামে রাতের অন্ধকারে একটা খালের ভেতর একজন লোক মার্ডার করে পালিয়েছিল। অথচ মাত্র সাত দিনের ভেতর সেই লোকটাকে ত্রিবেন্দ্রামের এক পার্বত্য উপত্যকায় এই পুলিসই অ্যারেস্ট করেছে। কি করে করল বলুন? দু' একদিন ছাড়া প্রায় রোজই যখন এই লাইনে এইভাবে ট্রেনে ডাকাতি হচ্ছে তখন দিন না কিছুদিন প্রত্যেকটি দূরপাল্লার ট্রেনের প্রতিটি কামরায় দু'চারজন করে সশস্ত্র সাদা পোশাকের পুলিসকে ছেড়ে। তারপর এদের কেমন না ধরা যায়?

ইনস্পেক্টর হেসে বললেন—তার অনেক অসুবিধা আছে ভাই। তোমরা ছেলেমানুষ, এসব ঠিক বুঝবে না।

ততক্ষণে গার্ড, চেকার, আরও অনেকে এসে জুটেছে।

পুলিসের একজন ফটোগ্রাফারও এসে গেছে। যে অভিনব কায়দায় বাবলুরা ডাকাত ধরেছে সেই কায়দায় ছবি পর পর কয়েকটা তুলে নিতেই পুলিসের লোকেরা ডাকাতদের হাতে হাতকড়া লাগাল।

ডাকাতরা সকলের সব জিনিস ফেরৎ দিল তখন।

পঙ্কুকেও তখন বার্থের তলা থেকে বেরিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে হয়েছে।

গার্ডসাহেব বললেন—ভাগ্যে এই কুকুরটা ঢুকে পড়েছিল কামরায়, ও না থাকলে কিছুই হত না। বলেই হ্যাট হ্যাট করে তাড়াতে গেলেন পঙ্কুকে—ব্যাটা পাগলা কুকুর নয় তো?

বাবলু বলল—না। ও কুকুর আমাদের পোষা। ট্রেনিং দেয়া কুকুর। ওকে আমরা সঙ্গে এনেছি। পথে বিপদ আপদ এলে বাঁচাবার জন্য।

—তাই নাকি? কিন্তু এটা তো দেশী কুকুর।

—হলে কি হয়। অ্যালসেসিয়ানের বাবা।

গার্ডসাহেব বললেন—তোমাদের পরিচয়?

বাবলু তাড়াতাড়ি ওর ব্যাগ থেকে একটা ফটো

বার করে দেখাল। মিঃ বর্মণ, কনক ভট্টাচার্য আর কাঞ্জিলাল নামে তিনজন দুঁদে দারোগার সঙ্গে পঞ্চুকে নিয়ে ওদের ছবি।

গার্ডসাহেব বললেন—তোমরা তাহলে পুলিসের লোক?

বাবলু বলল—না। আমরা সকলের। সবাই আমাদের পাণ্ডব গোয়েন্দা বলে।

বাবলু এবার পঞ্চুকে সকলের সামনেই ওকে আপার বার্থে তুলে নিল।

গার্ড, পুলিস সবাই নেমে যাবার পর কামরা-সুদ্ধ যাত্রী সকলেই এসে ছেঁকে ধরল এদের। প্রত্যেকেই যে যার মাল-পত্তর ফিরে পেয়ে খুব খুশী।

ট্রেন নড়ে উঠল।

সে রাত্রে আর ঘুম হল না কারও। গল্প করেই রাতটা কাটিয়ে দিল সকলে।

পরদিন সকাল সাতটায় ট্রেন থামল পুরীতে। ওরা সবাই যে যার মাল-পত্তর নিয়ে নেমে এল।

পুরীতে এসে প্রথমে একটু অসুবিধেয় পড়ল ওরা। কেননা বড়দিনের ছুটিতে বহু লোক পুরী বেড়াতে আসায় কোন হোটেলেই জায়গা পেল না ওরা। অবশেষে একজন লোক সহায় হতে সমুদ্রের ধারে মস্ত একটা খালি দোতলা বাড়ির ওপর তলায় একটা ঘর পেয়ে গেল ওরা। ঘরের জানালায় বসে সমুদ্র দেখা যায়। যতদূর চোখ যায় শুধু ধূ-ধূ করে নীল জলরাশি।

বাবলুরা অবাক্ হয়ে সেই জলরাশির দিকে চেয়ে রইল।

তারপর ঘরে মাল-পত্তর রেখে বাথরুমে স্নান সেরে বেশ ঝরঝরে হয়ে সবাই মিলে চলল মন্দিরে। মন্দির থেকে ফেরার পথে জগন্নাথের প্রসাদী ভোগ ডাল ভাত তরকারি কিনে নিয়ে এল। সকলে মিলে তাই খেয়েই শুয়ে পড়ল দরজা বন্ধ করে। কাল রাত্রে ট্রেনে ঘুম হয়নি। তাই শোয়া মাত্রই ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল সকলের।

ঘুম ভাঙল দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে।

বাবলু উঠে দরজা খুলে দিতেই বাড়ির মালিক বিপিনবাবু একখানা খবরের কাগজ হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। তারপর বললেন—কি ব্যাপার গো? খুব ঘুমোচ্ছিলে মনে হচ্ছে। বেড়াতে যাবে না?

বাবলুরা বলল—হ্যাঁ। খুব ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আপনি না ডাকলে সহজে এ ঘুম ভাঙত না। কাল সারারাত ট্রেনে জেগে এসেছি তো।

বিপিনবাবু হেসে বললেন—তোমাদের পরিচয় আমি আজকের খবরের কাগজ মারফৎ পেয়ে গেছি। এই দেখ তো এটা তোমাদেরই ফটো কিনা?

বাবলুরা কাগজের ছবির দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল—ও হ্যাঁ। কাল রাতে পুরী এক্সপ্রেসে চারজন ট্রেন-ডাকাতকে আমরা পুলিসের হাতে তুলে দিয়েছি। এ তারই ফটো।

বিপিনবাবু বাবলুকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন—তোমরাই তাহলে বিখ্যাত পাণ্ডব গোয়েন্দা! তোমাদের নাম আমি এর আগেও শুনেছি। যাক। ভালোই হল। তা আজ রাত্রে তোমরা ঘুরে বেরিয়ে এসে আমার বাড়িতেই খাওয়া দাওয়া করবে। কেমন? তোমাদের নিমন্ত্রণ রইল। এটা আমার যাত্রী নিবাস। এর পিছনে দুটো বাড়ির পরই আমার বসতবাড়ি। সেখানে আমার স্ত্রী পুত্র সবাই থাকে। এখানকার চাকরকে বললেই সে তোমাদের নিয়ে যাবে আমার বাড়িতে। যাবে তো?

বাবলু বলল—নিশ্চয়ই যাব।

বিপিনবাবু চলে গেলেন।

বাবলুরা সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয়ে বাইরে এসে

একটা দোকানে চা টোস্ট খেয়ে সমুদ্রের ধারে চলে এল। সূর্য তখন ডুবুডুবু। সূর্যাস্তের রক্তিম ছটায় সমুদ্রের জল লাল হয়ে উঠেছে। ওরা পাঁচজনে মনের আনন্দে পঞ্চুকে নিয়ে সী-বীচের উপর দিয়ে সমুদ্রের ঢেউ দেখতে দেখতে সামনের দিকে এগিয়ে চলল।

পঞ্চুর আনন্দ যেন সবচেয়ে বেশী। কখনো সে সামনের দিকে অনেকখানি এগিয়ে যাচ্ছে, কখনো আবার ছুটতে ছুটতে এসে বাবলুর পায়ে লুটিয়ে পড়ছে। কখনো জলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রের ঢেউতেও যেন ভয় নেই পঞ্চুর। ঢেউ সরে গেলেই সে নেমে যাচ্ছে জলের দিকে। আবার ঢেউ এলেই ছুটে পালিয়ে আসছে। দু' একটা অন্য কুকুর অবশ্য একবার আক্রমণ করবার চেষ্টা করেছিল পঞ্চুকে। কিন্তু বিলু আর ভোম্বলের পাকা হাতের মোক্ষম টিল দু একটা খাবার পর আর তারা এগোয়নি।

এইভাবে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে বেড়িয়ে অনেকটা পথ যাবার পর চারিদিক যখন অন্ধকারে ঢেকে আসছে, বাবলু তখন বলল—আর নয়। এবার ফেরা যাক। এখন আমরা মেন রোড ধরে বেড়াই গে চল।

বিলু বলল—সেই ভালো।

এই বলে ওরা ফিরতে যাবে এমন সময় দেখতে পেল সমুদ্রের জলের কাছে বালিতে কি যেন একটা চিকচিক করছে। ততক্ষণে চাঁদ উঠে গেছে। সেই চাঁদের আলোয় যেন চেকনাই দিয়ে উঠল জিনিসটা।

বাবলু বলল—কি বল তো ওটা ?

বিলু বলল—কোন দামী পাথর।

ভোম্বল বলল—নিয়ে আসব ওটা ?

বাবলু বলল—না। সমুদ্রের অত কাছে যাওয়া ঠিক নয়। ধারে কাছে কোন লোকজন নেই। অন্ধকার।

কিন্তু যে যাবার সে তখন কারো আদেশের অপেক্ষা না রেখেই চলে গেছে। অর্থাৎ কিনা পঞ্চু গিয়ে ততক্ষণে জিনিসটাকে শুঁকতে আরম্ভ করেছে।

হঠাৎ একটা ঢেউ এমন ভাবে সেটার ওপর লাফিয়ে পড়ল যে পঞ্চু কয়েক হাত পিছিয়ে এল। তারপর যখন ঢেউ সরে গেল তখন দেখা গেল অনেক দূরে সরে গেছে সেটা। আবার একটা ঢেউ এল। জিনিসটা তখন অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে। যেই না উঠে আসা পঞ্চু অমনি এক লাফে সেটা মুখে নিয়েই ছুটে এল বাবলুর কাছে।

বাবলু আদর করে পঞ্চুর পিঠ চাপড়ে বলল—সাবাস পঞ্চু। তারপর জিনিসটা হাতে নিয়ে বলল—আরে! কি চমৎকার আংটি রে ভাই।

সবাই তখন ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল আংটিটাকে।

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল—মনে হচ্ছে খুব দামী জিনিস।

বিলু বলল—একবার স্যাকরার দোকানে গিয়ে দেখালে কেমন হয় ?

বাবলু আংটিটা এ আঙুল ও আঙুল করে মাঝের আঙুলে পরে বলল—কোন দরকার নেই।

ওরা অন্ধকার থেকে আলোয় চলে এল এবার। মেন রোড ঘুরে বেড়াবার সময় বাবলুর হাতের সেই আশ্চর্য আংটির ছটায় চোখ ধাঁধিয়ে গেল সকলের।

মেন রোডে খুব বেশীক্ষণ ঘুরল না ওরা। বাসায় ফিরে এসে চাকরকে সঙ্গে নিয়ে বিপিনবাবুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেল।

বিপিনবাবুরা খুব ভালো লোক। স্ত্রী পুত্র নাতি নাতনীদের নিয়ে বিপিনবাবুর জমজমাট সংসার।

বাবলুরা যেতে সকলেই ওদের খুব সমাদর করলেন। তারপর বেশ হাসিখুশীতে ভরে উঠলেন সকলে।

বিপিনবাবুর স্ত্রী ওদের জন্য যে কত রকমের রান্না করেছিলেন তার ঠিক নেই। মাংস, পোলাও, চপ, পায়েস, তা ছাড়া এখানকার বিখ্যাত ছানার কেক, রসগোল্লা, দই এসব তো ছিলই।

গল্প করতে করতে বিপিনবাবুর হঠাৎ নজর পড়ল বাবলুর হাতের আংটিটার দিকে। ভুরু কুঁচকে তিনি সেদিকে তাকিয়ে বললেন—ও কিসের আংটি! তখন তোমাদের ঘরে গেলাম কিন্তু তোমার হাতে ও আংটিটা দেখলাম না তো?

বাবলু বলল—ওটা তখন পরিনি। গত বছর দার্জিলিং গিয়েছিলাম, সেখানে কিনেছিলাম ওটা পাঁচ সিকি দিয়ে। পেতলের আংটি। কাঁচ বসানো।

আংটির প্রসঙ্গ আসতেই বাবলুরা পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। তারপর তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ল যে যার।

আংটিটা দেখার পর বিপিনবাবু এবং ওনার স্ত্রীও কেমন যেন মিইয়ে গেলেন। দুজনেরই চোখে চোখে ইশারায় কি যেন কথা হল। বিপিনবাবু কেমন যেন সন্দেহের চোখে তাকালেন আংটিটার দিকে।

খাওয়া শেষ করে ওরা যখন চলে আসবে বলে পা বাড়াচ্ছে তখন হঠাৎ বিপিনবাবু বললেন—আমার একটা কথা বলবার ছিল তোমাদের।

বাবলু বলল—কি কথা?

—তোমার হাতের ঐ আংটিটার খুব কম করেও বেশ কয়েক হাজার টাকা দাম, ওটা হীরের আংটি। এবং ওতে যে হীরেটা বসানো রয়েছে সে হীরে এখন দুর্লভ। ও আংটি একবারও হাতছাড়া কর না। আবার সব সময় পরেও থেক না। যখন কোথাও যাবে তখন ঘরে রেখে যাবে। নাহলে বাগে পেলে যে কেউ ওটা কেড়ে নিতে পারে।

বাবলুর মুখটা ঈষৎ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তবু বলল—আচ্ছা। বলে বিপিনবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ওরা ওদের আস্তানায় গিয়ে ঢুকল। আস্তানাটি মন্দ নয়, তবে একটু সেকেলে ধরনের বাড়ি বলে যাত্রী নেই।

যাই হোক, ঘরে এসে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল সকলে। শুয়ে শুয়ে হীরের আংটির সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগল ওরা। বিপিনবাবুর প্রসঙ্গও উঠল।

বাবলু বলল—আংটিটা যে বহুমূল্য এ ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ। তবে বিপিনবাবুর ব্যাপারে আমি কিন্তু রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি।

বিচ্ছু বলল—আংটিটার দিকে কি ভাবে যেন তাকাচ্ছিল। না বাবলুদা?

—হ্যাঁ। আর ঐ তাকানোতেই মনে হল আংটিটা এর আগেও দেখবার সুযোগ ওনার হয়েছিল। কিন্তু এ আংটি সমুদ্রে এল কি করে এটাই হচ্ছে রহস্য।

বিলু বলল—মনে হচ্ছে খেলা জমবে।

ভোম্বল বলল—খুব সাবধানে কাছে কাছে রাখতে হবে এটাকে।

বাবলু বলল—আমার মনে হচ্ছে কাল পরশুর মধ্যেই এটাকে আমরা হারাব। এতক্ষণে লোক বোধ হয় লেগেই গেছে আমাদের পিছনে।

বিলু বলল—বলিস কি!

—হ্যাঁ। রাতভিতে একলা কেউ উঠবি না। ল্যাট্রিন যাবার দরকার হলে ঘরের নর্দমায় ছেড়ে জল ঢেলে দিবি। বুঝলি?

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল—আমাদের কেমন যেন ভয় করছে।

বাবলু বলল—ভয় কি? আজ দুপুরে সবাই

যে রকম ঘুমিয়েছি, তাতে রাতে আর ঘুম হচ্ছে না। একটু সজাগ তো থাকছিই আজ।

বাবলুর কথাই সত্যি। ঘুম এল না কারো চোখেই। সবাই শুয়ে শুয়ে চাপা গলায় নানারকম আলোচনা করতে লাগল।

রাত তখন কত তা কে জানে? হঠাৎ পঞ্চু ঘেউ ঘেউ করে ছুটে গেল জানলার দিকে। যেই না যাওয়া অমনি মনে হল কে যেন ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ল পাশের ছাদে।

পঞ্চুর চিৎকারে যেন কানে তালা ধরে গেল।

বাবলুও চোখের পলকে টর্চ হাতে ছুটে গেল জানালার কাছে। তারপর টর্চের আলো ফেলে পাশের ছাদটাকে ভালো করে দেখতে লাগল। কিন্তু কোথায় কে? আগন্তুক রাতের অন্ধকারে ততক্ষণে লুকিয়ে ফেলেছে নিজেকে।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ওরা বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এমন সময় দুজন নুলিয়া এসে হাজির—সমুদ্রে স্নান করতে যাবেন তো খোকাবাবুরা? চলুন। এই বাড়িতে যারা ভাড়া আসে আমরা তাদের নুলিয়া হই।

নুলিয়ার পিছন পিছন বিপিনবাবুও এলেন। বললেন—এদের দুজনকে একটা করে টাকা দেবে, কেমন? তাহলেই এরা তোমাদের সবাইকে ঢেউ খাইয়ে স্নান করিয়ে দেবে।

বাবলু বলল—বেশ তো। নুলিয়া ছাড়া সমুদ্রে তো নামা যাবে না। তা এদের সঙ্গেই না হয় যাওয়া যাবে।

কথা বলার সময়টুকুর মধ্যেই বাবলু দেখল বিপিনবাবুর চোখ দুটি কেমন যেন বার বার আকর্ষণ করছে বাবলুর হাতের আংটিটাকে।

বাবলুরা আর দেরি করল না। সবাই মিলে দলবদ্ধ হয়ে চলল সমুদ্রে স্নান করতে।

—কি হয়েছে গো তোমার পায়ে?

একজন নুলিয়ার পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। কি হয়েছে কে জানে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে।

বাবলু বলল—কি হয়েছে গো তোমার পায়ে?

—আর বলেন কেন? দিন রাত জলে জলে থাকি। কি যে একটা ছিল জলের তলায় তা কে জানে। তাতেই কেটে গেছে পা' টা।

—তাহলে তুমি জলে নামবে কি করে?

—কেন নাবব না? এ তো নোনা জল বাবু। এতেই তো ঘা শুকোয়।

ঘরে তালাচাবি দিয়ে নীচে নেমে এল ওরা। বাবলু নুলিয়াদের বলল—তোমরা ঘাটে যাও। আমরা আধঘণ্টার মধ্যেই যাচ্ছি। একটু জলযোগ সেরে নেব।

মুলিয়ারা চলে গেলে বাবলুরা একটা চায়ের দোকানে বসে চা, টোস্ট, ডিম-সেদ্ধ ইত্যাদি খেল। তারপর সমুদ্রে না গিয়ে সোজা চলে এল নিজেদের বাসায়।

ওদের ফিরে আসতে দেখেই চমকে উঠলেন বিপিনবাবু—কি হল! তোমরা এর মধ্যেই ফিরে এলে যে!

বাবলু—হ্যাঁ, ফিরে এলাম। আমাদের জানলার ওপাশে যে বাড়ির ছাদটা রয়েছে ওখানে একবার যেতে পারি কি?

—কেন?

—কাল রাত্রে একজন মাননীয় অতিথি জানলায় উঠে লক্ষ্য করছিলেন আমাদের। কিন্তু পঞ্চুর চোখে ধরা পড়ে গিয়ে তিনি কোন রকমে ছাদে লাফিয়ে গা ঢাকা দেন। সেইজন্যে ঐ ছাদে উঠে আমরা একটু দেখতে চাই অতিথি মহাশয়ের লাফ দেয়ার ফলে কোন কষ্ট হয়েছিল কিনা।

বিপিনবাবুর চোখ কপালে উঠে গেল। বললেন—এ কথা এতক্ষণ বলোনি কেন তোমরা? তারপর গম্ভীর মুখে বললেন—এত তাড়াতাড়ি যে ওরা তোমাদের পিছনে লাগবে তা আমি ভাবতেও পারিনি। খুব সাবধান!

বাবলু বলল—ওরা কারা?

—সে তোমাদের জানার দরকার নেই।

বাবলু বলল—বেশ। তবে ঐ ছাদে উঠে আমরা একটু দেখতে চাই।

বিপিনবাবু চাকরকে ডেকে পাশের বাড়ির ছাদে ওঠবার ব্যবস্থা করিয়ে দিলেন।

বাবলুরা পাশের বাড়ির ছাদে উঠে সব দেখল। এক জায়গায় কতকগুলো ভাঙা কাঁচ পড়ে ছিল। সেই কাঁচের ওপর পা পড়ায় অতিথি যথেষ্ট জখম হয়েছেন বোঝা গেল। পা কেটে একেবারে রক্তারক্তি হয়ে গেছে। চাপ চাপ রক্ত পড়ে আছে সেখানে। ছাদের ওপাশেই বালির টিপি। ছাদ থেকে উনি বালিতে লাফিয়েছেন। মাত্র দু'হাতের ব্যবধান। বাবলুরা দেখল বালির টিপি থেকে যে কোন লোক অনায়াসে এই ছাদে উঠতে পারে এবং ছাদে উঠে পাইপ বেয়ে জানালায় পৌঁছতে পারে। যাক, বাবলুরা সবাই একে একে ছাদ থেকে বালির টিবিতে নেমে এল। এখানে আর রক্ত পড়াটা বোঝা যাচ্ছে না। তবে পায়ের ছাপ বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। বাবলু অনেকক্ষণ ধরে সেই ছাপ লক্ষ্য করল। তারপর বলল—ঠিক আছে। তোরা সমুদ্রে চলে যা, আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই যাচ্ছি।

বিলু বলল—তুই একা কোথা যাবি বাবলু?

—যেখানে হোক। তোদের জানবার দরকার নেই। এই বলে চলে গেল বাবলু।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে বাবলু যখন আবার ফিরে এল সমুদ্রতীর তখন লোকজনে জমজম করছে।

মুলিয়ারা বলল—এত দেরি করলেন কেন খোকাবাবু?

—আমার এক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছিলাম, তাই দেরি হয়ে গেল।

—তা এবার জলে নামুন।

—হ্যাঁ।

মুলিয়ার হাত ধরে ওরা জলে নামল। ঢেউ খেল। স্নান করল। তারপর যখন উঠে এল ওপরে তখন বিলু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল—বাবলু, তোর আংটি কই?

বাবলুও চমকে উঠল—আরে! সত্যিই তো। আংটি কই?

মুলিয়া দুজন মনের আনন্দে হাসছে তখন। একজন বলল—ও আংটি তাহলে সমুদ্রেই পড়ে

গেছে খোকাবাবু! স্নান করতে গিয়ে খুলে গেছে হয়তো।

বাবলু বলল—তা যাক। কিন্তু তোমরা খুব খুশী হয়েছ মনে হচ্ছে!

—হ্যাঁ। তার কারণ বিপিনবাবু আমাদের বলেছেন আপনাদের একটু নজরে রাখতে। ছেলেমানুষ আপনারা। অত দামী জিনিস পরে থাকেন সব সময়। সেটা কি ঠিক! যে কোন মুহূর্তে আপনাদের বিপদ হতে পারে। তা এখন থেকে আর আপনাদের কোন ভয় নেই। আপনারা বিপদমুক্ত।

বাবলু বলল—সত্যি নাকি! যাক। তোমাদের অনেক ধন্যবাদ। তা আমাদের ওপর নজর রাখতে গিয়ে তোমরা যে অনেক কষ্ট সহ্য করেছ, সেজন্য তোমাদের ডবল ধন্যবাদ। তারপর পা-কাটা নুলিয়াটার দিকে তাকিয়ে বাবলু বলল—কিন্তু তোমার জন্যে সত্যিই আমার দুঃখ হচ্ছে। সামান্য একটু নজর রাখার কাজ করতে গিয়ে ঐভাবে জামলার ওপর থেকে ছাদে লাফিয়ে পা-টা কাটলে তো?

বলা মাত্রই মুখটা যেন মড়ার মুখের মতো সাদা হয়ে গেল নুলিয়াটার। বলল—এসব কি বলছেন?

—যা বলছি তা ঠিকই বলছি। তোমার ডান পা কেটেছে। আর বাঁ পায়ের একটা আঙুল নেই। আমাদের ঘরের পাশে বালির ঢিপিতে যে পায়ের ছাপটা আমরা দেখে এসেছি, এখানে ভিজে বালির ওপরে সেই পায়ের ছাপ হুবহু মিলে যাচ্ছে। কাজেই লুকোবার চেষ্টা কর না।

নুলিয়া দুজন কটমট করে একবার তাকাল বাবলুর দিকে। তারপর হনহন করে চলে গেল।

ওরা চলে গেলে বিলু অবাক্ হয়ে বলল—তোর বুদ্ধিকে বলিহারি যাই বাবলু। তুই এতও লক্ষ্য করেছিলি? কিন্তু আংটিটা কি করে পড়ল? অত দামী আংটি!

—ওটা পড়েনি। ঐ ব্যাটাই খুলে নিয়েছে।

—তুই বাধা দিলি না কেন?

—তাহলে বিপদ হত। ওরা হচ্ছে জলের পোকা। কোথায় টেনে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিত তা কে জানে?

সবাই বলল—ঠিক কথা। বাধা দিসনি ভালই করেছিস। দরকার নেই আংটিতে। যাক। এবার মনের আনন্দে ঘোরা যাবে, কি বল?

বাবলু বলল—দেখা যাক। এখন বাসায় ফিরি চল।

ওরা যখন বাসায় ফিরে এল তখন বিপিনবাবু বাবলুর হাতের দিকে তাকিয়েই বিস্মিত ভাবে বলে উঠলেন—তোমার আংটিটা কই?

বাবলু বলল—সমুদ্রে নাইতে গিয়েছিলাম, সেখানেই হাত থেকে খুলে পড়ে গেছে। তা যাক। ওতে আমাদের কোন লোভ নেই। কিন্তু একটা কথা আমাদের জানাবেন কি? ঐ আংটিটা কার?

বিপিনবাবু বললেন—তা আমি কি করে জানব? তবে দেখেই বুঝেছিলাম ওটা খুব দামী আংটি। সেইজন্যে সাবধান করে দিয়েছিলাম।

বাবলু বলল—অশেষ ধন্যবাদ। তবে আংটির রহস্যটা আপনি আমার মুখ থেকেই শুনুন।

বিপিনবাবু চমকে উঠে বাবলুর মুখের দিকে তাকালেন।

বাবলু বলল—আজ থেকে দশ বছর আগে যশোর থেকে এক জমিদারপুত্র বেশ কয়েক লক্ষ টাকার অলঙ্কার নিয়ে গোপনে সীমান্ত লঙ্ঘন করে এদেশে পালিয়ে এসেছিল। জমিদারের পুত্র হলে কি হয়, সে ছিল একজন খুনি আসামী। বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে গোলমাল হওয়ায় সে তার পরিবারের

প্রায় প্রত্যেককেই খুন করে এদেশে পালিয়ে আসে। তারপর সারা ভারতের সমস্ত তীর্থে তীর্থে সে ঘুরে বেড়াতে থাকে। এই ভাবেই সে পুরীতেও এসে হাজির হয়। এবং এইখানে এই বাড়িতেই সে এক মাসের জন্য ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে।

বিপিনবাবু যেন ঘেমে নেয়ে উঠলেন। কঠিন গলায় বললেন—এসব তোমাকে কে বললে ?

—যেই বলুক, আমি শুনেছি।

—ওসব সত্যি নয়।

—সত্যি না হলে আপনি এত উত্তেজিত হয়ে উঠতেন না। যাক। তারপর শুনুন—।

—আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাই না।

—শুনতেই হবে। তারপর হঠাৎ একদিন সেই জমিদারপুত্র খুন হয়। আপনি এবং আপনার লোকেরা তাকে খুন করেন। এ বাড়ির মালিক ছিল তখন অন্য লোক। যাই হোক, খুন করে তার সর্বস্ব হরণ করে যখন আপনারা মৃতদেহ বালির বস্তায় বেঁধে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন সেই সময় ঐ হীরের আংটিটা নেবার জন্যে আপনাদের মধ্যে প্রচণ্ড মারামারি হয় এবং দুজন সেই মারামারির ফলে নিহত হয়। নিহত দুজনের নাম দশরথ পাটসেনা ও বৃন্দাবন রথ। এদেরই একজনের হাতে ছিল সেই হীরের আংটিটি। মরবার সময় আংটিটা সে সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে দেয়। দৈবক্রমে সেই সময় পুলিস এসে পড়ে এবং কয়েকজনকে ধরেও ফেলে। আপনি এবং আরো দু'একজন গা ঢাকা দেন। আপনারা ফাঁকা মাঠের বেড়াল। তাই পুলিস কিছুই করতে পারে না আপনাদের। কোর্টে কেস ওঠে। কয়েকজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। কিন্তু প্রমাণের অভাবে আপনারা সন্দেহ-ভাজন হওয়া সত্ত্বেও ছাড় পেয়ে যান। পরে এই বাড়ি আপনি কিনে নেন এবং এখানে ঘর ভাড়ার ব্যবসা শুরু করেন। আপনি এখন প্রচুর টাকার মালিক। জমিদারপুত্রের অনেক টাকাকড়ি এবং অলঙ্কার আপনার ভাগে পড়েছে।

বিপিনবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন—চাবকে লাল করে দেব তোমাকে, ডেঁপো ছোকরা কোথাকার। উলটো-পালটা বলবার জায়গা পাওনি ?

বাবলু বলল—শুনুন। আমি যা বললাম তার এক বর্ণও মিথ্যে নয়। কেননা খুনের পরে পুলিস এই বাড়ি তল্লাসী করে জমিদারপুত্রের লেখা একখানি ডায়রি থেকে এই কথা জানতে পারে। এ পুলিসের রিপোর্ট। মিথ্যে নয়।

—কিন্তু তুমি কি করে জানলে ?

—সেটা যথাসময়েই জানতে পারবেন। যাক, আমাদের হাতে ঐ আংটিটা নেহাত ভাগ্যক্রমেই এসে পড়ে। সমুদ্রতীরে ঐ আংটিটি আমরা কুড়িয়ে পাই। কিন্তু আপনার লোভী চোখ ঐ আংটি দেখা মাত্রই লোলুপ হয়ে ওঠে এবং আপনি ওটা কৌশলে হস্তগত করবার জন্য একদিকে আমাদের সতর্ক হতে বলেন, অন্যদিকে আমাদের পিছনে লোক লাগান। যে নুলিয়া দুজনকে আপনি লাগিয়েছিলেন তারা আপনারই পোষা শাগরেদ। ওরা লোককে জলে নামিয়ে কৌশলে তাদের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে আংটি, হার, পদক ইত্যাদি ছিনতাই করে। আমার হাতের আংটিও আপনার নুলিয়ারা জলে নামিয়ে হস্তগত করে নিয়েছে।

বিপিনবাবু এবার মারাত্মক রকমের হিংস্র হয়ে ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করে বললেন—হ্যাঁ, নিয়েছে। ঐ আংটি পাবার জন্যে আমি দিনের পর দিন প্রচুর অর্থ ব্যয় করে সমুদ্র তোলপাড় করেছি। কাজেই ওটা পাবার অধিকার আমার আছে।

এমন সময় হঠাৎ নুলিয়া দুজন এবং জনা চারেক লোক ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হল সেখানে।

বিপিনবাবু বললেন—মাল যথাস্থানে লুকিয়ে ফেলেছ ?

একজন মুলিয়া বলল—ও আংটি জাল।

বিপিনবাবু চিৎকার করে উঠলেন—হোয়াট !

—ও আংটি আসল আংটি নয়।

—হতেই পারে না।

মুলিয়া ছাড়াও যে চারজন লোক ওদের সঙ্গে ছিল তারা বলল—আপনি আমাদের সঙ্গেও খুপরি-বাজি খেলতে চাইছেন বিপিনবাবু ?

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু-বিচ্ছু তো কিছুই বুঝতে পারল না, কি হল ব্যাপারটা। এত সব কথা বাবলুই বা জানল কি করে ?

বিপিনবাবু বললেন—এ সব ষড়যন্ত্র।

আগন্তুকরা সঙ্গে সঙ্গে পিস্তল বার করে উঁচিয়ে ধরল বিপিনবাবুর দিকে। বলল—ঠিক করে বলুন আংটি কোথায় ?

মুলিয়া দুজনও তখন চেপে ধরেছে—আজ একটা হেস্তনেস্ত করবই। আমাদের ঠকানোর চেষ্টা করলে আমরা কিছুতেই ছাড়ব না।

বিপিনবাবু বললেন—উলটো চাপ দেবার জায়গা পাওনি শয়তানরা। আংটি ছিনতাই করে এখন আমাকে এসেছ ভয় দেখাতে, ধাপ্পা দিতে ?

বাবলু এবার বলল—ওনারা তো ঠিক কথাই বলছেন। ও আংটি তো জাল।

লোকগুলো তখন বাবলুর দিকে তাকিয়ে বলল—তুমি ঠিক বলছ খোকা ?

বাবলু বলল—হ্যাঁ। আমরা যখন স্নান করতে যাই তখন বিপিনবাবু আমাদের বললেন, তোমরা ছেলেমানুষ। এত দামী আংটি পরে স্নান করতে যেও না। ওটা আমাদের জিম্মায় রেখে এই নকল আংটিটা পরে যাও। নাহলে এখানকার মুলিয়ারা চোর। জলে নামিয়ে ওরা হাত থেকে আংটি খুলে নেবে। আমরা তাই বিশ্বাস করে আংটিটা ওনার কাছে দিয়ে যাই, এখন স্নান করে এসে আংটি ফেরৎ চাইছি। কিন্তু উনি দিতে চাইছেন না। চোখ রাঙাচ্ছেন। ওনার মূর্তি তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন।

বিপিনবাবু গলা ফাটিয়ে বললেন—মিথ্যে কথা। সব মিথ্যে। ওরা মিথ্যেবাদী।

আগন্তুকরা বলল—আর আপনি খুব সত্যবাদী। বলুন শীগগির আংটি কোথায় রেখেছেন ? নাহলে চারজনের চারটে পিস্তলই একসঙ্গে গর্জন করে উঠবে।

মুলিয়ারা বলল—এরা ছেলেমানুষ। জাল আংটির পরিকল্পনা কখনো এদের মাথায় আসে ? এ সবই আপনার প্ল্যান। আমাদের ঠকাবার ষড়যন্ত্র।

বাবলু বলল—ঠিক তাই। আমরা চাই লোকটা যেন ওর উপযুক্ত শিক্ষা পায়। ও আংটিতে আমাদের কোন দরকার নেই। তবে আংটিটা ও যেন ভোগ করতে না পারে। গায়ের জোরে কেড়ে নিন ওটা।

আগন্তুকরা বাবলুকে বলল—উনি আংটিটা নিয়ে কোথায় রেখেছিলেন দেখছ ?

বাবলু বলল—হ্যাঁ ! বলেই বাঁদিকের একটা আধো অন্ধকার ঘরের দিকে দেখাল।

ওরা বিপিনবাবুকে বলল—আংটি কি ঐ ঘরেই আছে ?

—জানি না।

—তাহলে আপনি মৃত্যুর জন্যে তৈরি হন। ওয়ান-টু-থ্রি বলার সঙ্গে সঙ্গেই চার চারটে পিস্তল একসঙ্গে গর্জে উঠল।

বিপিনবাবুর রক্তাক্ত দেহ লুটিয়ে পড়ল মেঝেয়।

বাচ্চু-বিচ্ছু সভয়ে চিৎকার করে উঠল।

আগন্তুকরা একবার শুধু চেয়ে দেখল ওদের

দিকে। তারপর নুলিয়া দুজনকে ধরে বলল—এর মধ্যে তোদের কোন কারসাজি নেই তো?

—বাঃ রে। মাল তো আমরাই তুলে দিলাম আপনাদের হাতে!

—তা তো দিলি। কিন্তু আসলটা লুকিয়ে নকলটা দিসনি তো?

নুলিয়া দুজনের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল—শেষকালে আমাদের সন্দেহ? ছেলেরা তো নিজেরাই বলছে আংটিটা ওরা বিপিনবাবুর কাছে রেখে গেছে। তবু সন্দেহ কেন?

—সন্দেহ করবার কারণ আছে বৈকি! কাল রাত্রে যখনই তোরা ছেলেমেয়েগুলোকে টারগেট করেছিলি তখনই আমাদের সন্দেহ হয়েছিল। আর কাল রাত্রেই ছেলেগুলোর হাতে ঐ আংটি আমরা প্রথম লক্ষ্য করি। তবে এটা যে ঐ জিনিস তা ভাবিনি, কিন্তু যখনই দেখলাম তোরা ওদের পিছনে লেগেছিস তখনই আমাদের সন্দেহ হল। আমাদের না জানিয়ে নিজেরা কেন দাঁও মারতে গেছলি বল?

—কিন্তু পরে তো সব বলেছি। আর তাছাড়া সমুদ্রতীর থেকে আমরা তো অন্য কোথাও যাইনি। সোজা আপনাদের কাছেই গেছি। আপনারাও লক্ষ্য করেছেন আমাদের। যদি ওটা লুকোই তাহলে তো আমাদের কাছেই থাকবে। সার্চ করুন।

ওরা কি বুঝল কে জানে, বলল—ঠিক আছে। তোরা বিপিনবাবুর লাশ আণ্ডারগ্রাউণ্ডে ঢুকিয়ে দে। আমরা ততক্ষণ এ ঘরটা সার্চ করি।

বিপিনবাবুর চাকরটা সেই সময় বাজার করে ফিরে এসেছিল। নুলিয়ারা চোখের পলকে তাকে ধরে আনল তখন। বলল—এই ব্যাটাকেও এক্ষুনি ওর মনিবের কাছে পৌঁছে দিন। নাহলে ও ধরিয়ে দেবে আমাদের।

চাকরটা বলল—আজ্ঞে আমার কি দোষ?

কিন্তু কে দোষী কে নির্দোষী এসব দেখবার সময় আগন্তুকদের নেই। আরো একটি পিস্তলের শব্দ হল 'গুড়ুম'।

আর একটা লাশ লুটিয়ে পড়ল মেঝেয়।

নুলিয়ারা সঙ্গে সঙ্গে লাশ দুটো সিঁড়ির নীচে আণ্ডারগ্রাউণ্ডের গর্তে ঢুকিয়ে দিল। তারপর একজন দৌড়ে গিয়ে বন্ধ করে দিয়ে এল বাইরের দরজাটা।

বাবলু, বিলু, ডোম্বল, বাচ্চু আর বিচ্ছুর মাথাতেও আসছে না তখন কি করে এদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। পঞ্চুও বোধহয় ভয় পেয়ে গেছে।

এমন সময় হঠাৎ সুযোগ এসে গেল।

বাবলুর দেখিয়ে দেয়া ঘরে ওরা সবাই ঢুকে পড়ে তল্লাশী চালাতে লাগল তখন।

বাবলু এদের ইশারা করে নিজেও ঢুকে পড়ল ঘরে। তারপর যেন ওদেরই দলে, এমনভাবে এটা ওটা সেটা ধরে খোঁজাখুঁজি করতে করতে পায়ে পায়ে দরজার কাছে এসেই সশব্দে বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল দরজাটা। বন্ধ করেই শিকল তুলে দিল।

ওরা সবাই বন্দী হয়ে ঘুষি মারতে লাগল দরজায়—কি হল? দরজায় শেকল দিলে কেন? শীগগির খোল দরজা। নাহলে আমরা একবার বেরুতে পারলে কিন্তু তোমাদের কাউকে আস্ত রাখব না।

বাবলু বলল—যদি বেরুতে পারেন তাহলে আপনাদের যা খুশী তাই করবেন। কিন্তু বেরুতে আপনারা পারছেন না। তার কারণ দরজা মাত্র একটাই।

ওরা বলল—প্লিজ। আমাদের ছেড়ে দাও ভাই। লক্ষ্মীটি। তোমাদের আংটি আমরা খুঁজে

বার করে তোমাদের হাতেই ফেরৎ দেব, কথা দিলাম।

বাবলু বলল—তার আগে জানলা গলিয়ে পিস্তলগুলো আপনারা বাইরে ফেলে দিন।

—বেশ তো, তোমরাই কেউ এসে নিয়ে যাও।

—না। আমরা যেমন দরজার আড়ালে আছি তেমনই থাকব। আপনারা দু'জনকে যখন খুন করতে পেরেছেন তখন এখান থেকে যাবার সময় আমাদেরও খুন করবেন, সেটা অনুমান করেই আপনাদের আটকালাম।

—আরে দূর। তাই কখনো পারি ?

—ওসব বাজে কথা রেখে যা বলছি তাই করুন।

বন্দীরা বেগতিক বুঝে পিস্তলগুলো জানলা গলিয়ে সিঁড়ির দিকে ছুঁড়ে দিল। এক—দুই—তিন—চার

বাবলু সেগুলো কুড়িয়ে এনে বলল—এবার একটু বিশ্রাম করুন আপনারা। আমরা পুলিস ডেকে আনছি।

—পুলিস ! পুলিস কেন ?

—বাঃ রে। পুলিস যে আপনাদের হীরের আংটি উপহার দেবে।

—পুলিসের সঙ্গে আংটির কি সম্পর্ক ! আমাদের ছেড়ে দাও। সত্যি বলছি, ছাড়া পেলে আমরা তোমাদের অনেক টাকা দেব।

বাবলু বলল—টাকার আমাদের দরকার নেই, আর আংটিও আমরা চাই না। চাই না বলেই সমুদ্রে স্নান করতে যাবার আগে আমি কাউকে না জানিয়ে থানায় চলে যাই এবং আমার কুড়িয়ে পাওয়া হীরের আংটি আমি সেখানে জমা দিই। আর তখনই পুলিসের মুখ থেকে এই বাড়ির ইতিহাস এবং আংটির রহস্য জানতে পারি। পুলিস বলেছে, আমাদের সাহায্য করবার জন্য তারা সব

বন্দীরা পিস্তলগুলো জানালা গলিয়ে সিঁড়ির দিকে ছুঁড়ে দিল।

সময় প্রস্তুত। আমরা খবর দিলেই তারা ছুটে আসবে। যাই হোক, আমার সন্দেহ হয়েছিল ও আংটি আমাদের হারাতে হবে। তাই ওটা পুলিসের হাতে জমা দিয়ে তার রসিদ নিয়ে দোকান থেকে একটা কাচ বসানো মেকি আংটি পরে সমুদ্রে স্নান করতে যাই। পরের ঘটনা তো সবই জানেন আপনারা। যাক, এবার আপনারা খাঁচা-গাড়িতে চেপে বৃন্দাবন দেখবার জন্য তৈরি হন। আমি এলুম বলে।

বাবলু তখন সবাইকে পাহারায় নিযুক্ত রেখে

চলে গেল থানায়। তারপর রসিদ দেখিয়ে ওর আংটিটা ফেরৎ নিয়ে আদ্যোপান্ত সব খুলে বলতেই পুলিসের লোকেরা জিপ ভ্যান যা যা ছিল সব নিয়ে হইহই করে ছুটে এল।

তারপর সবাইকে গ্রেফতার করে ভ্যানে উঠিয়ে মৃতদেহ দুটো সুড়ঙ্গ ঘর থেকে বার করল।

দারোগাবাবু বাবলুকে বললেন—তোমরা তাহলে কোথায় থাকবে?

—আপাততঃ কোন একটা হোটেলে। যদি জায়গা না পাই তাহলে আজই রাতের ট্রেনে কলকাতায়।

—না। তার দরকার হবে না। তোমরা ভারত সেবাশ্রমে চলে যাও। ওদের রিজার্ভ ঘর থাকে। আমাদের লোক সঙ্গে গেলে সেই ঘর খুলে দেবে ওরা।

বাবলু বলল—আপনারা সেই ব্যবস্থাই করে দিন তাহলে। আমার বন্ধুরা রইল। আমি এক্ষুণি একবার দু'এক মিনিটের জন্যে আসছি। এই বলে ঝড়ের বেগে চলে গেল বাবলু।

খানিক বাদে ঝড়ের মতোই আবার ফিরে এল সে।

সবাই অবাক্ হয়ে বলল—কি ব্যাপার। কোথায় গেছলে?

—সমুদ্রের ধারে।

—হঠাৎ?

—আংটিটার একটা সদগতি করতে।

দারোগাবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন—তার মানে?

—ওটা যার জিনিস তাকেই দিয়ে এলাম। সমুদ্র থেকে পেয়েছিলাম, সমুদ্রেই ফেলে দিয়ে এলাম ওটা।

—করলে কি! ওর যে অনেক দাম!

—আমার কাছে ওর কোন দামই নেই স্যার। ও বড় অভিশপ্ত জিনিস। ও যেখানে থাকবে সেখানেই রক্তারক্তি ঘটাবে।

কারো মুখে কোন কথা নেই। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু মাল-পত্তর নিয়ে বেরিয়ে এল। পুলিসের লোকেরা ওদের নিয়ে চলল ভারত সেবাশ্রমের দিকে।

বাইরে তখন প্রচণ্ড ভিড়।

পঞ্চুও চলল ওদের সঙ্গে।

পুলিস তখন গোটা বাড়িটাকে আরও ভালো করে তল্লাশ করছে। বাড়িটার আগাগোড়াই ঘিরে আছে পুলিসে।

ব্যাঙের ডাক—

—এই খোকা, তুমি শুধুমুহু জলে ভিজছ কেন? বল, কোন্ ছাতাটা তোমার পছন্দ?

"৺প্রমোদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"য়
প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

লোভের সাজা মৃত্যু

পীযূষকান্তি দত্ত

দৈত্যরাজ বৃত্র পড়ে গেছে মহাদুশ্চিন্তায়—স্বর্গরাজ্য অধিকার করে নিশ্চিন্তে স্বর্গসুখ ভোগ করা যায় কি উপায়ে? এমনই দুর্ভাগ্য তার যে, সমুদ্রমন্থনের পর যে অমৃত এল অসুরদেরই অধিকারে, কৌশলে তা-ই হরণ করে দেবতারা হয়ে গেলেন অমর। ফলে যত শক্তিধরই হোক না বৃত্র, দেববংশকে চিরতরে ধ্বংস করে নিশ্চিন্ত সে হতে পারবে না। স্বর্গরাজ্য সে যদি একবার অধিকার করেও বসে, তবুও দেবতারা তা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা নিশ্চয়ই করবেন, আর তাতে তার পরাজয়ের সমূহ সম্ভাবনা। অতঃপর করণীয় কি?

এই হল অসুরদের চিরাচরিত স্বভাবের স্বরূপ। কিছুতেই সন্তুষ্ট নয় তারা, স্বর্গ তাদের চাই-ই, চাই! স্বর্গে দেবতাদের একাধিপত্য তারা মোটেই স্বীকার করবে না। অথচ অনাদিকাল থেকে বারে বারে তার ব্যর্থও হয়েছে স্বর্গে স্থায়ী অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে। এবং স্বর্গের বর্তমান দখলদারও দেবতারাই।

কিন্তু না, এবার যে কোনও উপায়েই হোক, স্বর্গ জয় করবে এবং সেখানে স্থায়ী রাজত্বও কায়েম করবে সে,—এই ভেবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হল বৃত্র, আর সে কাজের পন্থা স্থির করল এই—সকল দেবতার ঊর্ধ্বে, দেবতাদেরও দেবতা যিনি, সেই মহাদেবেরই স্তব করবে সে। নান্যঃ পন্থাঃ।

যেমনি ভাবা, তেমনি কাজ। শুরু হল সেই স্তব।

দিনের পর দিন যায়, মাসের পর মাস আসে, স্তব করতে করতেই। মহাদেব কিন্তু সাড়া দেন না মহাসুরের ডাকে। তখন আরও একাত্ম হয়ে ডাকতে থাকে বৃত্র। তাতে দেবতারা পর্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেন, বিস্মিত তো বটেই।

অবশেষে টলে যায় স্বর্গে মহাদেবের আসনও। ভক্তের আহ্বানে ভগবান ছুটে আসেন মর্ত্যে। তার সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে বলেন—বৎস বৃত্র! তোমার স্তবে আমি সন্তুষ্ট। এখন বর প্রার্থনা কর।

প্রার্থনা করল বৃত্র—ভগবন্! আমায় দাও শুধু অজেয় শক্তি।

তথাস্তু—বলে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন দেবাদিদেব।

তারপর···

পরমবিক্রমে স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করল বৃত্র। যুদ্ধ চলল।

শেষে অধমের কাছে মাথা নোয়াতেই হল উত্তমকে। পরাজিত হয়ে অজ্ঞাতবাস করতে লাগলেন দেবতারা। স্বর্গের অধিকার এবার হল অসুরদের কুক্ষিগত।

কিন্তু লোভের শাস্তি পেতেই হবে বৃত্রকে—এই হল তার ভাগ্যলিখন। অতএব সেই শাস্তি পাবার একটা উপলক্ষ্যও থাকা চাই। তাই স্বর্গরাজ্য অধিকার করেও সন্তুষ্ট হতে পারল না বৃত্র। শুরু করল দেবতাদেরই প্রতি আরও অত্যাচার। বোধ করি আরও বেশী কিছু চায় সে। ফলে প্রস্তুত হয়ে গেল চরম শাস্তির পথ।

মর্তে এসে মুনির সম্মুখে উপস্থিত হলেন।

অত্যাচারে বিব্রত হয়ে দেবতারা বাধ্য হলেন পিতামহ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হতে। তিনি তাঁদের দুঃখবেদনার কাহিনী শুনে বললেন—বৃত্র নিধনের একমাত্র উপায় হতে পারে, যদি দধীচি মুনির অস্থি দিয়ে বজ্র তৈরি করা যায়। সে মুনির বাস এখন মর্ত্যে, এক অরণ্যে।

এখন সমস্যা হল এই যে, মুনির মৃত্যু অবধি অপেক্ষা করতে হলে বৃত্রের অত্যাচারে দেবতাদের অস্তিত্ব মুছে যেতে পারে। অতএব মুনি ইচ্ছামৃত্যু বরণ না করলে তাঁদের আত্মরক্ষার পথ বন্ধ। কিন্তু শুধু স্বার্থের খাতিরে কোন্ মুখে তাঁরা তাঁকে সে অনুরোধ করে বলবেন, মুনিদেব, আপনি দয়া করে মৃত্যুবরণ করে হাড় ক'খানা আমাদের দিন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা অপেক্ষা করতে পারলেন না। মর্ত্যে এসে মুনির সম্মুখে উপস্থিত হলেন। কিন্তু লজ্জায় তাঁদের মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোল না। অধোবদনে দাঁড়িয়ে রইলেন তাঁরা।

কিন্তু মুনি অন্তর্যামী, লোকের মনের কথা বুঝতে পারতেন। ধ্যানে বসে সবই জানতে পারলেন তিনি। দেবতাদের মনের কথা জানতে পেরে তিনি বললেন—আমার এই তুচ্ছ দেহের বিনিময়ে যদি আপনাদের এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তবে তাতে আমি বরং কৃতার্থই হব।

তারপর দেবতাদের কল্যাণ কামনা করতে করতে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন তিনি। তাঁর আত্মা অমরধামে গমন করল। পড়ে রইল নশ্বর অস্থিময় দেহ। ধন্য ধন্য রবে মুখর হয়ে উঠলেন দেবতারা। পুষ্পবৃষ্টি হল মুনির সর্বাঙ্গে।

ত্রিভুবনের শ্রেষ্ঠ শিল্পী বিশ্বকর্মা দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে দধীচির অস্থি দিয়ে প্রস্তুত করলেন এক শক্তিশালী বজ্র। দেবরাজ করলেন সেই বজ্রনিক্ষেপ আর তাতে নিহত হল সবংশে, সদলে বৃত্রাসুর।

অতি লোভের পরিণামে অমিতশক্তিশালী হয়েও বৃত্রাসুরও শেষ অবধি টিকে থাকতে পারলে না। তাহলে অতি লোভের ফলে সাধারণ মানুষের কপালে কত দুঃখ থাকতে পারে তা একটু ভাবলেই বোঝা যায়।

"৺প্রমোদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"য়
দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু

দিলীপকুমার সিংহ

অনেক কাল আগের কথা। ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জ মহকুমান্তর্গত বিক্রমপুর পরগনার পূর্ব প্রান্তে থানা ও সাবরেজেস্ট্রী অফিস টঙ্গীবাড়ির অধীন এবং টঙ্গীবাড়ি থেকে অনধিক দুই মাইল দক্ষিণে রাউৎভোগের ঠিক পূর্বে যশোলঙ্গ গ্রাম অবস্থিত। সিংহ বংশের আদি পুরুষ রাজা নিত্যানন্দ এই গ্রামের নামাকরণ করেন 'যশোলঙ্গ'। গ্রামে হিন্দু ও মুসলমান প্রত্যেক জাতই বাস করত। গ্রামের লোকদের স্বাস্থ্য সাধারণতঃ ভাল। ঐ গ্রামের পশ্চিম পার্শ্বে 'নুড়াইতলি' নামে একটি স্থান আছে। সেখানে পুত্রবতী মায়েরা সন্তানের মঙ্গল কামনায় অশ্বত্থ বৃক্ষের ডালে নুড়ি বেঁধে রাখতেন। কথিত আছে, যাদের মঙ্গল কামনা করে এই নুড়ি বাঁধা হত, অমঙ্গল তাদের স্পর্শ করতে পারত না। গ্রামে সাধারণ লোকের অবস্থা তত স্বচ্ছল নয়। মধ্যবিত্ত ও গরিবের সংখ্যাই অধিক।

এই গ্রামে একটি ছেলের কথা আমার বার বার মনে পড়ে। নাম তার ভিখারি। তার জন্মের কিছুদিন পরে তার বাবার মৃত্যু হয়। তার মা ছাড়া জগতে আর কেউ ছিল না। সম্পত্তির মধ্যে ছিল কেবল মাত্র তাদের বাস্তুবাড়ি। বিধবা মা অতি কষ্টে তাকে বড় করে তোলে। মার মনে শান্তি নেই। একমাত্র ছেলে ভিখারি, তার আবার পিঠে কুঁজ। সেই কুঁজের জন্য সে ভাল করে চলতে, বসতে, শুতে পারত না। ভিখারি একটু বড় হতে তার মা ধামা বানিয়ে দিত। ভিখারি সেগুলি নিয়ে গ্রামে গ্রামে বিক্রি করত। সে ছিল খুবই সরল, সাদাসিধে। কোন লোককে সে ঠকাত না। সে মাকে খুব ভক্তি করত। সকালবেলা ধামার বোচকা নিয়ে ধামা বিক্রি করতে বের হত, সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফিরে আসত। সারাদিনে যা পয়সা পেত সবই মাকে দিয়ে দিত। এইভাবে বিধবা মাকে নিয়ে তাদের সংসার কোন রকমে অতিবাহিত হত।

প্রতিদিনের মতো, একদিন ভিখারি ধামার বোচকা পিঠে নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু সেদিন তার একটি ধামাও বিক্রি হল না। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে এল। বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে। পথে অনেক বিপদ। তাছাড়া বাড়ি ফিরবেই বা কি নিয়ে? এ সব নানা চিন্তা করতে করতে সে পথের ধারে এক কালী মন্দিরের বারান্দায় উঠে বসল। স্থানটির নাম হলদিয়া। মার কথা সে চিন্তা করতে লাগল।

ওদিকে অভাগিনী মাও ছেলের জন্য চিন্তার জাল বুনে চলল, আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। এক সময় ভিখারি বারান্দার উপর ঘুমিয়ে পড়ল।

সে দিনটা ছিল অমাবস্যা। চারিদিকে অন্ধকারে ঢাকা। প্রতি রাত্রে এক সন্ন্যাসী সেই মন্দিরে পূজা করেন। রাত্রি দুইটার সময় সেই সন্ন্যাসী পূজার উপকরণ নিয়ে মন্দিরে উপস্থিত হলেন। বারান্দার উপর ঘুমন্ত ভিখারিকে দেখতে পেয়ে তিনি তাকে ঘুম থেকে ডেকে তুললেন। তাকে

জিজ্ঞাসা করলেন, "বৎস, কে তুমি? কি উদ্দেশ্যে এখানে আগমন?" ইত্যাদি নানা প্রশ্ন।

তখন ভিখারি তাঁকে সব কথা বলল। সেই সঙ্গে তার কুঁজের জন্য যে তাকে খুব কষ্ট পেতে হয় এবং সংসারের দুঃখের কথাও জানাল। সব শুনে সন্ন্যাসী সামনের একটি পুকুর থেকে তাকে স্নান করে আসতে বললেন। সেই সঙ্গে বলে দিলেন, "সাবধান ভিখারী, তিন ডুবের বেশী যেন না হয়।"

ভিখারি স্নান করে মন্দিরে ফিরে এল। তার সেই ধামায় বোঁচকাটা সন্ন্যাসীর কাছে জমা রেখে গিয়েছিল। সে আসতেই সন্ন্যাসী তার গায়ে কমণ্ডলু থেকে জল নিয়ে ছিটিয়ে দিলেন। তাকে ঠাকুরের সামনে বসতে বললেন। সন্ন্যাসী কালীপূজা আরম্ভ করলেন। তাঁর মন্ত্র উচ্চারণ শুনলে গা ছমছম করতে থাকে। জাগ্রত কালীমা। পূজা শেষ করে যখন সন্ন্যাসী উঠলেন তখন তিনি যেন এক আশ্চর্য রূপ ধারণ করেছেন। তাঁর দিকে তাকান যায় না। তারপর সন্ন্যাসী নিজ দৈব-শক্তির প্রভাবে ভিখারির কুঁজ ভাল করে দিলেন। তারপর পূজার প্রসাদ দিলেন। এর পর তাকে ধামার বোঁচকাটা দিলেন এবং বললেন, "এটা কাল রাত্রে ঠিক বারোটার সময় তুই একলা ঘরে এটা খুলবি। খবরদার যদি রাস্তায় খুলিস তবে বিপদ হবে।"

এদিকে সকাল হয়ে এল। তখন সে সন্ন্যাসীর চরণধূলি নিয়ে সেই মন্দির থেকে বিদায় নিল। তার খুবই আনন্দ হল—কারণ এখন সে সাধারণ মানুষের মতো চলতে পারছে। সে আবার চিন্তা করে, তার মা তাকে চিনতে পারবে কি না। নানা কথা ভাবতে ভাবতে সে গ্রামে এসে উপস্থিত হল। কিন্তু গ্রামবাসীরা তাকে চিনতে পারল না।

পথে যার সঙ্গেই দেখা হয় তখনই ভিখারি তাকে তার কথা বলে। কিন্তু কেউই তার কথা বিশ্বাস করতে পারল না। ক্রমে সে বাড়িতে এসে উপস্থিত হল। বাড়ির দরজার সামনে থেকে সে 'মা' 'মা' বলে চিৎকার করতে থাকে। তার মা ঘর থেকে দৌড়ে বের হল। কিন্তু দৌড়ে এসেও সে হঠাৎ থেমে গেল। সে তার ছেলেকে চিনতে পারছে না। সে বুঝতে পারল না যে স্বপ্ন দেখছে সে কি না। ভিখারি 'মা' 'মা' বলে তাকে জড়িয়ে ধরল। মাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। সে পূর্ব রাত্রের অলৌকিক কাহিনীর কথা এবং বোচকার কথা মাকে জানাল। তার মা ভগবানকে ডাকতে লাগল এবং আনন্দে কেঁদে উঠল।

এদিকে গ্রামময় শোরগোল পড়ে গেল এই ভিখারির চেহারা দেখে। তাদের মনে নানা প্রশ্নের উদয় হতে থাকে। একি সম্ভব, না কোন মায়ার খেলা। গ্রামের মোড়লগোছের লোকদের কাছেও এই সংবাদ পৌঁছে গেল। এই সংবাদ সত্যি কি মিথ্যা যাচাই করবার জন্য তারা সব ভিখারির বাড়িতে এসে হাজির হল। নিজের চোখে ভিখারিকে দেখে সত্যি ওরা অবাক্ হল। ভিখারি প্রত্যেকের মতো তাদেরও বোঁচকার কথা বাদ দিয়ে ঘটনাটি বলতে লাগল।

ভিখারি সন্ন্যাসীর কথামতো রাত বারোটার সময় একলা একটি ঘরের মধ্যে বোঁচকাটি খুলল। তার মধ্যে সে একটি সোনার ধামা পেল। তখন সে চিন্তা করতে লাগল যে, তার মার হাতে বোনা ধামাগুলি কোথায় গেল? ঠিক সেই সময় সেই সোনার ধামা থেকে এক দৈববাণী শুনতে পেল—"তুমি এই সোনার ধামার কাছে যা চাইবে তাই পাবে। কিন্তু বৎস, একটি কথা মনে রাখবে যে, যা পাবে তার ঠিক ঠিক ব্যবহার করবে।" এর পর দৈববাণী বন্ধ হয়ে গেল। ভিখারি তখন তা যাচাই করার জন্য তার আগের ধামাগুলি চাইল এবং স[illegible] সঙ্গে সেগুলি এসে হাজির হল। এই দেখে [illegible]

আনন্দের সীমা রইল না। সে মার কাছে ছুটে গেল এবং ধামার কাহিনী ও রহস্য বলল।

ক্রমে তাদের অবস্থা ফিরতে লাগল। এদিকে ধামার কথা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ল। এমন কি অনেক দূর থেকে লোক তাদের অবস্থা দেখবার জন্য আসতে লাগল।

কয়েক গ্রাম পরে ছিল 'কোলা' গ্রাম। সেই গ্রামে এক দুষ্ট লোক বাস করত। তার নাম দিগেন্দ্রনাথ বোস। তার ছেলের নাম ব্রজকিশোর। তার পিঠেও একটা কুঁজ ছিল। তখন দিগেন্দ্র ঠিক করল তার ছেলেকে যদি ধামার বোঁচকা দিয়ে পাঠান যায় সেই মন্দিরে, তবে সেও পুত্রের দৌলতে বড়লোক হতে পারবে। বাবা যেমন দুষ্ট প্রকৃতির, ছেলেও তেমন দুষ্ট ও অসৎ প্রকৃতির। এদিকে ব্রজকিশোর ভাবে ভিখারির মতো সেও যদি সোনার ধামা পায় তবে সে প্রথমে ধামার বদলে একটি রাজপ্রাসাদ চাইবে, তারপর অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র চাইবে। নানা জল্পনা-কল্পনার মধ্য দিয়ে তার দিন কাটে। তার বাবা এক অমাবস্যার দিন দেখে তাকে একটা ধামার বোঁচকা দিয়ে মন্দিরে পাঠাল। ব্রজকিশোরও মন্দিরের বারান্দার উপর ঘুমিয়ে পড়ল। ঠিক রাত্রি দুটোর সময় সন্ন্যাসী এলেন। তিনি ব্রজকিশোরকেও ভিখারির মতো একই প্রশ্ন করলেন। ব্রজকিশোর ইনিয়ে বিনিয়ে তার মিথ্যা দুঃখের কাহিনী বলতে লাগল, সেই সঙ্গে কুঁজের কথাও জানাল। সন্ন্যাসী ব্রজকিশোরকেও একই সাবধানবাণী বলে পুকুর থেকে স্নান করে আসতে বললেন। কিন্তু লোভী ও দুরাত্মা ব্রজকিশোর তিনটি ডুবের পরিবর্তে চারটি ডুব দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে তার শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হতে লাগল।

সন্ন্যাসীর নিকট ফিরে আসতেই সন্ন্যাসী বুঝতে পারলেন দুরাত্মা ব্রজকিশোরকে। তখন

ব্রজকিশোর ইনিয়ে বিনিয়ে তার মিথ্যা দুঃখের কাহিনী বলতে লাগল।

তিনি কমণ্ডলু থেকে তার গায়ে জল ছিটিয়ে দিলেন, ফলে তখনকার মতো গন্ধ বন্ধ হল।

ব্রজকিশোরের খুব আনন্দ হতে লাগল। সে বুঝতেও পারল না যে, সন্ন্যাসী তাকে চিনতে পেরেছে।

তারপর সন্ন্যাসী পূজায় বসলেন। পূজাশেষে ব্রজকিশোরকেও তিনি কমণ্ডলু থেকে জল ছিটিয়ে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার কুঁজও আর দেখা গেল না। কিন্তু আগের দুর্গন্ধ আবার তার গা থেকে বের হতে থাকল। সন্ন্যাসী তাকে তার ধামার বোঁচকাটি ও পূজার প্রসাদ দিলেন। ব্রজকিশোর এতই আনন্দিত হল যে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করতে পর্যন্ত ভুলে গেল। সন্ন্যাসী তাকেও ঐ বোঁচকাটি রাত্রি বারোটার আগে খুলতে নিষেধ করে দিলেন।

সে মনে মনে স্বপ্নের জাল বুনতে বুনতে গ্রামের দিকে রওনা হল। যথাসময়ে নিজ গ্রামে এসে হাজির হল, কিন্তু একটি বৈশিষ্ট্য তাকে দেখে চিনতে পেরেও কোন লোক তার সামনে আসছে না। দূর থেকে নাকে কাপড় চেপে চলে যায়। এসব ব্যাপার ব্রজকিশোর লক্ষ্য করছিল।

বাড়িতে এসে 'মা' 'মা' বলে ডাক দিতেই তার মা ও বাবা দুজনে দৌড়ে বের হল। তাকে দেখে খুবই আনন্দ হল, কারণ ব্রজকিশোরের পিঠে এখন আর কুঁজ নাই। কিন্তু তারা দূরে সরে গেল এবং নাকে কাপড় চাপা দিল, ব্রজকিশোরের গা থেকে তখনও দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। তারা ভাবল হয়তো কোন মায়ার খেলা হবে।

তারা তাড়াতাড়ি ছেলেকে খাইয়ে-দাইয়ে সন্ধ্যার সময় ধামার বোঁচকা দিয়ে একটি ঘরে রেখে দিল এবং নিজেরা ঘরের বাইরে বসে রইল। ব্রজকিশোর সন্ন্যাসীর কথা অমান্য করে লোভের বশে রাত বারোটার আগেই বোঁচকাটি খুলল। ব্রজকিশোর বোঁচকার মধ্যে একটি ধামাও দেখতে পেল না, সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল এক বিরাট বিষধর সাপ। পাপী ব্রজকিশোরকে দংশন করল। সঙ্গে সঙ্গে 'মা' 'মা' চিৎকার করে ব্রজকিশোর মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তার চিৎকার শুনে তার মা ও বাবা দুজনে একসঙ্গে ঘরের ভিতর ছুটে এল, দেখল এক বিষধর সাপ ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। তারা ব্রজকিশোরের কাছে গিয়ে দেখে মৃত ছেলের দেহটি মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। পাপাচারী ও লোভী পিতা দিগেন্দ্রেরও পুত্রের মৃত্যুতে উচিত শিক্ষা হল।

বারাণসীর জঙ্গমবাড়িতে অবস্থিত ঈগল ক্লাবের পক্ষ হইতে শ্রীসুভাশীষ মল্লিক, ক্লাবের স্বর্গগত উপাধ্যক্ষ সুকোমল সেনগুপ্তের পুণ্যস্মৃতিরক্ষাকল্পে একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতার প্রস্তাব করেছেন। তাঁর প্রস্তাব অনুসারে আমরা

৺সুকোমল সেনগুপ্ত স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা

নামে একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা আহ্বান করছি।

প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু :

—বারাণসীর গল্প—

রচনা পাঠাবার শেষ তারিখ ৩১শে বৈশাখ ১৩৮৩। প্রতিযোগিতার ফলাফল ও পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা আগামী ১৩৮৩ শ্রাবণ সংখ্যা শুকতারায় প্রকাশিত হবে। প্রতিযোগিতার কোনও লেখা ফেরত পাঠান হয় না।

প্রথম পুরস্কার ১৫·০০ টাকা ● **দ্বিতীয় পুরস্কার ১০·০০ টাকা**

মজার পাতা

নতুন ধাঁধা

১। দশে দশে গুণ করে গোষ্ঠী যুক্ত কর তায়—
রূপের বাহারে সে জগৎ মাতায়।

—সুভা বিশ্বাস।

২। না কাটলে উড়ত যখন,
পেট কাটলে কেন ?

—বিদিশা ও বৈশাখী দাস, ডিসেরগড়।

৩। প্রথমেই মানা করি। আগা-গোড়া জুড়ে,
গলাই না কভু ভাই পরের ব্যাপারে।
অবহেলে পার হই জলধি অপার,
বল দেখি কে বা আমি কি নাম আমার ?

—রুদ্রদেব ভট্টাচার্য, ভদ্রকালী।

গত মাঘ সংখ্যার ধাঁধার উত্তর

১। নয়ন ২। সময় ৩। সন্দেহ

গত মাঘ সংখ্যার ধাঁধার নির্ভুল উত্তরদাতাদের নাম

কলিকাতা—স্বাতী ও দ্বৈপায়ন দত্ত—রানী হর্ষমুখী রোড; ঝণ্টু, মণ্টু, সণ্টু শ্রাবণী ও বুড়ি—যদু মিত্র লেন; অমিত, অতীন ও অজন্তা রায় চৌধুরী—পূর্বসিঁথি রোড; জয়বীর, রণবীর, সাধনা ও নির্মল—রামগড়; স্বপন, গৌরী, শেখর, জয়ন্তী ও দেবযানী চক্রবর্তী—বিরাটী; দেবব্রত রায়—প্যারীচরণ সরকার স্ট্রীট; রুপু, বুবুল, রিংকু, মামণি ও বাবা—বড়িশা; বড়াই, বকাই, মহারাজ, মহাবীর ও কেশিয়ার—আর. জি. কর মেন হোস্টেল; দেবাশীষ, ইন্দ্রাণী ও কস্তুরী—পশ্চিম পুটিয়ারী; মঞ্জুশ্রী ব্যানার্জী—বিধান সরণী; প্রদোষকুমার ও নন্দদুলাল দাস—প্রতাপ চ্যাটার্জী লেন; বাবা, মা, শুভ্রা, মানস, রাণা, রুপু ও বিকাশ—হালদার পাড়া রোড; ইন্দ্রনীল বাগচী—পর্ণশ্রী-পল্লী; রিংকু, টুম্পু ও ইলা বসু—বেহালা; সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়—সেবক বৈদ্য স্ট্রীট; অজিত, অমিত, বিশ্বজিৎ, মণ্ট ও দেবাশিষ—মেডিক্যাল কলেজ হস্টেল।

২৪ পরগনা—শেফালী, আরতি, প্রণতি, ভারতী ও টুটু ঘোষ—শ্যামনগর; মা, বাবু, বাপি, ভুলু ও খোকন—গোচরণ; অর্ঘ, অজন্তা, অসিত ও অভিজিৎ চ্যাটার্জী—বেলঘরিয়া; অমিত, সুমিত, বরুণা ও তথাগত ভট্টাচার্য—ভাটপাড়া; অরুণকুমার ঘোড়ই—লক্ষ্মীজনার্দনপুর; কিংশুক, লালু ও নীলু—ডায়মণ্ডহারবার; আশা ও সাগর—পানিহাটী; রত্না ও জয়জিৎ বসু—ভাটপাড়া; শান্তিময় হাজারী ও অসিতবরণ পাল—আমতলা; শাহাজাহানউদ্দিন আমেদ—রাজারহাট; রিংকু, ঝুমা, ছোটি, রাজু, অতনু ও সঞ্জয়—ব্যারাকপুর; সুমা, অভিজিৎ, কেয়া, চন্দন, কাজল ও পুতুল—ব্যারাকপুর।

হাওড়া—মীরা, বিমান, রীতা, কমল, চৈতালী ও রাত্রি—শিবপুর; লালটু, দীপু, দুলাল, শ্যামা, শেফু প্রভৃতি—চ্যাটার্জীহাট; রাধাকান্ত পাত্র—কৃষ্ণধন কর লেন; প্রতাপ লাহা—ইছাপুর।

হুগলী—শুভ্রা, শুক্লা, সুদীপ্ত ও সুমন্ত পাঠক—চুঁচুড়া; মধুমিতা, অরিন্দম ও দীপালি—রথতলা; শুভ্রা দাস—চন্দননগর; অরূপ, অনুপ, অলক, সিদ্ধার্থ প্রভৃতি—চুঁচুড়া; নন্দিনী, ইন্দ্রাণী ও অরূপ রুদ্র—শ্রীরামপুর; কয়াপাট আদর্শ টিউটোরিয়াল হোমের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ—কয়াপাট; ডেজি, সেতু, রবি, টুম্পা ও উত্তম চ্যাটার্জী—শ্রীরামপুর; কৃষ্ণা, কাবেরী, জনা, স্বপা, মধু ও মিলিবৌদি—চুঁচুড়া।

বর্ধমান—চন্দন, কাজল, ঝুম্পা, বাবা ও মা—দুর্গাপুর-৫; মাণিক, বাবলু, রাম, সুবীর, ঝর্ণা, রমা ও জীবন দাস—বর্ধমান; অপু, রণজিত, বীথিকা, কণিকা, সোমা ও লিপি—বোলকুণ্ডা; ইন্দ্রাশিস্ ও দেবাশিস ঘোষ—দুর্গাপুর; মৃদুলা, সুচেতা ও মানসী—বার্নপুর; রীণা, বৃত্তি ও ডি. পি. সেণ্টারের কর্মীরা—আসানসোল; বিদিশা ও বৈশাখী দাস—সাকতোড়িয়া; জ্যোৎস্না, বাণী, শুভজিৎ ও অভিজিত—রূপি কাজোরা কলিয়ারী; বটব্যাল, সিকদার, গুণময়, সন্তদাস ও লক্ষ্মী-নারায়ণ দাস—কালীপাহাড়ী; প্রসূন, দীপান্বিতা, প্রতীক, প্রদীপ্ত ও প্রবীর ধাড়া—রাণীগঞ্জ; অমল, ইলা, বিমল, কমল, সুমনা প্রভৃতি—চরণপুর; বিশ্বনাথ, জবা, বুম্বা, ভোলানাথ, মীরা ও ভালোমামা—বার্নপুর; অরূপ, মুনমুন, তুতু, লাল ও বাপী—ডিসেরগড়; বাপী, রীতা ও ঝর্ণা চৌধুরী—দুর্গাপুর; প্রকাশ চক্রবর্তী—বার্নপুর; রবি, বাবন ও ছোটকু—ডিসেরগড়; স্নেহতোষ, শুভ্রশ্রী, মধুশ্রী, শঙ্খশ্রী ও দেবতোষ—বর্ধমান; বাবা, মা, মঞ্জু, অঞ্জু, রঞ্জন, লিলি ও স্বপা ব্যানার্জী—দুর্গাপুর; মেজমামা, সেজমামা, দিদি, চন্দনা এবং গৌতম ভাণ্ডারী—কামারপাড়া; ছবি, কাজু, লুলু ও ভুলু সেন—চিত্তরঞ্জন; সুব্রত, স্বপন, নিশিকান্ত ও তুষারকান্ত—বনপাস।

নদীয়া—সমরেন্দ্র, শান্তনু ও শিবেন বিশ্বাস—শান্তিপুর; প্রভাতী, রঞ্জু, লুসি, পুঁচ্‌কি, বাবু প্রভৃতি—কৃষ্ণনগর; মা, বারা ও চুমকি—কল্যাণী।

পুরুলিয়া—দেবব্রত রায়—পুরুলিয়া; হরকান্ত, সুবীর ও সুব্রত সাহা—আদ্রা; শ্রীরাজ, স্বপন, শ্যামলমামা, সাধু, রুমা ও সোমা—মানবাজার; মানা, পিকা, বাপী, বড়মামা ও তৃপ্তি ঘটক—অলঙ্গিডাঙ্গা; কাকলী, তমালী, কৌশিক ও বৈশাখী চৌধুরী—নীলকুঠিডাঙ্গা; দিলীপকুমার চৌধুরী—মানবাজার; অরূপকুমার গোস্বামী—নীলকুঠী-ডাঙ্গা; টিটু, মিণ্টু, বিউটি, বেবী ও বাসু—মুনসেফডাঙ্গা; গোপাল, মাণিক, গৌতম ও সর্বানী মল্লিক—হুইসা।

বীরভূম—বাপী, অনুরাধা, শিখা, সৌমিত্র ও আশিষ ভৌমিক—দুবরাজপুর; বিকাশ, প্রকাশ, মলয়, বনজা, অমুজা, তনুজা ও দ্বিজকা—দুবরাজপুর; নীলু, ডন ও অন্ত দাস—শান্তিনিকেতন; সেণ্ট, বাসন্তী, চৈতালী ও শ্রাবণী—মুরারই।

(স্থানাভাবে বাকী উত্তরদাতাদের নাম আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।)

হাঁদা-ভোঁদার

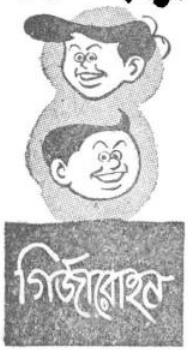

গির্জারোহণ

যা ভেবেছিলাম এ তার চেয়েও সোজা!
দ্যাখ্ ভোঁদা, আমি এভারেস্টের চূড়ো মানে গির্জার চূড়ো ছুঁয়েছি!
ওরে বাবা! হড়কে গেলুম যে!
বাঁচাও!
যাক্, দড়ির প্যাঁচে আটকে গেছি!
অ্যাই ভোঁদা! আমি কি ত্রিশঙ্কু হয়ে থাকবো নাকি?
হিঃ হিঃ! ঘাবড়াস নে হাঁদা! রাতটা শূণ্যমার্গে কোন রকমে কাটিয়ে দে! সকাল হলেই আমি গির্জারোহণকারীকে উদ্ধারের জন্যে লোকজন নিয়ে আসছি! চলি রে বড্ড ঘুম পাচ্ছে!

আনন্দ আর ধরে না

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

বিল্টু-মন্টুদের আনন্দ আর ধরে না। অন্য বছর এই সময়টা ওরা কি ভয়ে ভয়েই না কাটায়। সব সময় কি হয় কি হয় ভাব! কে দল ছেড়ে যাবে—কে দলে আসবে—এই সব নিয়ে ওরা ভাবনা-চিন্তায় অস্থির হয়ে ওঠে। রাত্তিরে ভালো করে ঘুমোতেই পারে না। ভোর বেলায় ঘুম থেকে উঠে ওরা দুজনে বাইরের ঘরে এসে বসে থাকে। কাগজ দিয়ে গেলে তাড়াহুড়ো করে খেলার পাতা খুলে ওরা আগে দেখে নেয় কে কে সেদিনে দল বদল করেছেন সেই খবরটা।

এবার অবশ্য গোড়ায় গোড়ায় সব ঠিক ঠাক হয়ে গেছে। ওরা ভাবতেই পারেনি যে, ইস্ট-বেঙ্গলের সুভাষ ভৌমিক মোহনবাগানে চলে আসবেন। সেই দিনই আবার হাবিব, আকবরও এসেছিলেন। তারপরই এসে গেলেম সমরেশ চৌধুরী। তাই ওদের আনন্দ আর ধরে না। স্কুলে গিয়ে ওরা এখন ভণ্টেদের দিকে তাকিয়ে হাসে। বলে, "দেখলি তো, তোদের গুরুকে আমরা কেমন নিয়ে নিলাম। ফরোয়ার্ড লাইনটা এবার দেখেছিস কেমন হবে? চাবুক রে, চাবুক—সুভাষ, হাবিব, আকবর, উলগা, জহর…"।

ভণ্টে-নণ্টেরাও চুপ করে থাকে না, "রাখ রাখ, আমাদেরও খারাপ নাকি?—সুরজিৎ, রণজিৎ, শুভঙ্কর, শ্যাম থাপা—দেখনা আরও কে কে আসে।"

মোট ফুটবল খেলোয়াড়দের দল বদল নিয়ে ওরা মানে বিল্টু-মন্টু, ভণ্টে-নণ্টেদের মতো ফুটবল পাগল ছোটরা এখন মেতে আছে। কোন্ দল কেমন হল—সেই চিন্তা এখন সকলের। এক মাস ধরে এখন ওরা ঐ চিন্তা ভাবনা নিয়েই দিন কাটাবে।

এবার জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় জিতে বাঙলা যখন সন্তোষ ট্রফি নিয়ে এল তখন সকলের কি আনন্দ! ভণ্টেরা তো লাফাচ্ছিল। অবশ্য ওদের বেশী আনন্দ হবার কারণও আছে। ইস্ট-বেঙ্গলের খেলোয়াড়রা যে কোজিকোডে দারুণ খেলেছিলেন। ফাইনাল খেলায় 'ম্যান অফ দি ম্যাচ' হয়েছিলেন সুভাষ ভৌমিক। আর প্রতি-যোগিতার সেরা খেলোয়াড়ের সম্মান লাভ করে-ছিলেন সুরজিৎ সেনগুপ্ত। এর পরেও কি আনন্দ হবে না? কিন্তু সেই সুভাষ ভৌমিক দল ছেড়ে চলে গেছেন। এ দুঃখও ভণ্টেদের কাছে কম নয়।

দল বদলের পালা এবারের মত শেষ হয়ে এল। এরপর শুরু নতুন আর পুরনো খেলোয়াড়দের গড়ে পিটে দলটি শক্তিশালী করে নেবার জন্যে প্রশিক্ষণ পর্ব। আর সেই প্রশিক্ষণ দেবেন নাম-করা প্রশিক্ষকরা।

গল্প হলেও সত্যি

সেদিন এক দারুণ ব্যাপার ঘটে গেল। দু'দলে মারামারি হয় আর কি। বিল্টু-মন্টুরা ওদের গলিতে ক্রিকেট খেলছিল। খেলাটা খুব জমেছে। বিল্টুরা জিতবে না হারিবে বোঝাই যাচ্ছে না। তখন ভণ্টের একটা বল বিল্টুর ব্যাটে লেগে মাটিতে পড়ার আগেই ঢুকে গেল ওর পায়ের প্যাডের মধ্যে। নণ্টে ছুটে এসে বলটা তুলে নিয়ে চিৎকার করে উঠল, "হাউজ দ্যাট?"

আম্পায়ার কিন্তু আউট দিলেন না। বললেন, "বলটা 'ডেড' হয়ে গেছে। আউট হবে না বিল্টু।"

একটু পরেই বিল্টুর ব্যাটের কানায় লেগে বলটা চলে গেল উইকেট রক্ষকের হাতে। বাপী উইকেট-কিপার হয়েছিল। বলটা সে ঠিক মত ধরতে পারল

না। হাত থেকে বলটা গলে গেল। কিন্তু মাটিতে পড়ল না। ঢুকে গেল ওর প্যাডের মধ্যে। চন্দন ছিল স্লিপে। ছুটে এসে সে বলটা তুলে নিয়ে আবেদন জানাল। আর কি আশ্চর্য! আম্পায়ার সঙ্গে সঙ্গে আউটের নির্দেশ দিলেন!

আর যাবে কোথায়! শুরু হয়ে গেল গোলমাল। একদিকে বিল্টুরা অন্য দিকে ভণ্টেদের দল। মধ্যিখানে আম্পায়ার। ওঁরই হয়েছে যত জ্বালা। কিছুতেই ওদের বোঝাতে পারছেন না ব্যাপারটা। শেষ পর্যন্ত মারামারিটা কোন রকমে বন্ধ করতে পারলেও খেলা আর হল না।

আসলে কিন্তু আম্পায়ার ঠিকই করেছেন। কিন্তু ছোটরা মানবে কেন? ওরা তো আর নিয়ম-টিয়ম জানে না! তাই ব্যাটসম্যানের পোশাকের মধ্যে ঢুকলে বলটা 'ডেড' হবে আর উইকেট কি পায়ের মধ্যে গেলে হবে না—এ কথাটা ও ভাবতেই পারে না।

এবার একটা গল্প বলি। একদম সত্যি ঘটনাটা। এটা জানা থাকলেই বোঝা যাবে যে, ব্যাটসম্যানের পোশাকের মধ্যে বল চলে গেলে কেন সেটা 'ডেড' হয়ে যায়।

অনেকদিন আগের ঘটনা। ক্রিকেট খেলা তখন সবে হাঁটি হাঁটি, পা পা করছে। নিয়ম-টিয়ম বেশী হয়নি। সেই সময় ডাব্লিউ. জি. গ্রেগ নামে একজন খেলোয়াড় ছিলেন। তাঁকেই 'ফাদার অফ ক্রিকেট' অর্থাৎ ক্রিকেট খেলার জনক বলা হয়। সেই গ্রেগ সাহেবের চেহারা ছিল মস্ত বড়। লম্বা চওড়া দারুণ দেখতে। তারও পর তাঁর ছিল এক মুখ দাড়ি। দাড়িগুলো এতো বড় ছিল যে বুকে এসে ঠেকেছে। দাড়ি আর গোঁফের আড়ালে মুখটা যেন হারিয়ে গেছে।

সেদিন খেলা হচ্ছিল। গ্রেস সাহেব তখন ব্যাট করছিলেন। দারুণ ব্যাট করতেন তিনি।

ফুটবল প্রায় এসে গেল। তার তোড়জোড় চলছে চারদিকে। খেলোয়াড়রা এখন দল বদল করছেন। এর পরই শুরু হবে প্রশিক্ষণের পালা। ছবিটি কোজিকোডে এবারের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার সময় তোলা। খেলছে কলকাতার খেলোয়াড় নিয়ে গড়া রেল দল।

আর মজাও করতেন খুব। হঠাৎ হল কি, একটা বল লাফিয়ে উঠল মাটিতে পড়ার পর। মুখ বাঁচাবার জন্যে গ্রেস তাঁর ব্যাটটা তুলে ধরলেন। আর বলটা তাঁর ব্যাটের এক কানায় লেগে সোজা এসে ঢুকে গেল গ্রেসের বুক পকেটের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে

গ্রেস সাহেব রান নিতে শুরু করলেন। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটে—রান নিচ্ছেন তো নিচ্ছেনই। ফিল্ডাররা সব হাঁ করে তাকিয়ে আছে। তাদের চোখ গোল গোল হয়ে গেছে। কোথায় গেল বলটা ?

গ্রেস সাহেব কিন্তু তখনো রান নিয়ে চলেছেন। হঠাৎ একজন ফিল্ডারের মনে হল, ডব্লিউ. জি.র বুকটা কেমন উঁচু উঁচু ঠেকছে না ? তবে কি, তবে কি···ছুটে গিয়ে তিনি গ্রেগের বুক পকেটে হাত চালিয়ে দিলেন—তারপর সকলকে অবাক্ করে দিয়ে বের করে আনলেন বলটা। এতোক্ষণে কিন্তু গ্রেস সাহেবের অনেকগুলো রান নেওয়া হয়ে গেছে।

তখন ক্রিকেটের কর্তারা দেখলেন, এ তো ভারী মুশকিল। এই ভাবে ব্যাটসম্যানকে কিছুতেই রান নিতে দেওয়া যায় না। তখন তাঁরা 'ডেড বল' নিয়মটি করলেন। নিয়মটি হল—

"বলটি ডেড হয়েছে কিনা তা নির্ভর করবে আম্পায়ারের মতামতের ওপর। বল ডেড হয় এই কারণে (ক) যখন উইকেট-রক্ষকের হাতে অথবা বোলারের হাতে বলটি পাকাপাকি ভাবে চলে যায়, (খ) যখন বাউণ্ডারী লাইন পার হয়ে যায়, (গ) খেলা হোক বা না হোক ব্যাটসম্যান অথবা আম্পায়ারের পোশাকের মধ্যে বলটা ঢুকে যায়; (ঘ) আম্পায়ার 'ওভার' বা 'টাইম' ঘোষণা করলে; (ঙ) লস্ট বল ঘোষণা করা হলে; (চ) কোন ফিল্ডার টুপি বা পোশাকের সাহায্যে অবৈধ ভাবে বল ধরলে; (ছ) কোন ব্যাটসম্যান আহত হলে কিংবা খেলা সাময়িক ভাবে বন্ধ করতে হলে।

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND OTHER PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER ("Suktara") TO BE PUBLISHED IN THE FIRST ISSUE EVERY YEAR AFTER THE LAST DAY OF FEBRUARY

FORM IV

1. Place of Publication—11, Jhamapook Lane, Calcutta-9.
2. Periodicity of its Publication—Once in a Month.
3. Printer's Name—S. C. Mazumdar.
   Nationality—Indian.
   Address—New Bengal Press (P.) Ltd., 68, College Street, Calcutta-12.
4. Publisher's Name—S. C. Mazumdar.
   Nationality—Indian.
   Address—21/1, Jhamapooker Lane, Calcutta-9.
5. Editor's Name—Madhusudan Mazumdar.
   Nationality—Indian.
   Address—21/1, Jhamapooker Lane, Calcutta-9.
6. Names and Addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital—Dev Sahitya Kutir Private Ltd.,—Shareholders : S. C. Mazumdar, N. C. Mazumdar, K. C. Mazumdar, M. S. Mazumdar, B. C. Mazumdar, P. K. Mazumdar.

21, Jhamapooker Lane, Calcutta-9.

I, Subodh Chandra Mazumdar, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. S. C. Mazumdar—
Signature of Publisher.

Free !! **Free !!** **Free !!**

ধবল বা শ্বেত

আমাদের চিকিৎসা সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই শরীরের সাদা দাগ মিলিয়ে গিয়ে ত্বকের স্বাভাবিক রঙ ফিরে আসবে। তাই আমাদের চিকিৎসা পদ্ধতি রাতারাতি জনসাধারণের মধ্যে বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। আমাদের ঔষধের ব্যবহারের প্রথম দিন থেকেই উপকারিতা লক্ষ্য করা যাবে। অসুখের পূর্ণ বিবরণসহ বিনামূল্যে আমাদের ঔষধের জন্য সত্বর নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ঃ

BHARAT AYURVEDASHRAM

P. O. KATRI SARAI (GAYA)

নব কল্লোল

বিশেষ নববর্ষ সংখ্যা ● বৈশাখ ১৩৮৩

এই সংখ্যায় লিখবেন ঃ

সমরেশ বসু	নারায়ণ সান্যাল
নিমাই ভট্টাচার্য	সুধীন্দ্রনাথ রাহা
প্রফুল্ল রায়	সুরেশচন্দ্র সাহা
মায়া বসু	দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়
রণতোষ সাহা	ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত
ডাঃ রায়	ডাঃ গুপ্ত

এ ছাড়া সিনেমা, রঙ্গমঞ্চ, সংবাদ, ছবিতে গল্প, কার্টুন ইত্যাদি অন্যান্য নিয়মিত ফিচার।

পৃষ্ঠাসংখ্যা বৃদ্ধি হবে। মূল্য বৃদ্ধি হবে।

ছেলেরা যখন ছোটো থাকে...

তখন তো তাদের দুরন্ত হওয়াই স্বাভাবিক। আর যারা স্বভাবতই শান্ত তারাও তো কখনো সখনো দুরন্তপনা করে। খেলতে গিয়ে অন্য সবায়ের মতো তারাও হাত-পা কেটে ফেলে। শরীরের নানা জায়গা তাদেরও ছড়ে যায়। ঘষা লাগে।

এইসব কাটা-ছেঁড়া-ফাটা-ঘষালাগা জায়গাগুলো দূষিত হ'য়ে উঠতে কী খুব সময় লাগবে। কারণ ধুলো-বালির নোংরা ধুলেও সহজে যায় না। তাই **বোরোলীন** হাতের কাছে রাখতে পরামর্শ দেওয়া।

বোরোলীন

ব্যবহারের অভ্যাস ছেলেবেলা থেকেই গ'ড়ে তোলা ভালো। দুরন্তপনার দিনগুলো থেকেই জানতে হবে, ছোটোবেলার দুষ্টুমির চিহ্নগুলো যাতে দূষিত না হ'য়ে ওঠে, যাতে ত্বক সুস্থ, সবল, স্বাভাবিক ও মালিন্যমুক্ত থাকে তারজন্য সুরভিত

অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম **বোরোলীন**

ব্যবহার করাই নিরাপদ।

জি, ডি, ফার্মাসিউটিক্যালস প্রাঃ লিমিটেড
বোরোলীন হাউস, ১ [illegible], কলিকাতা-৭০০ ০০৫

—কলেজের ছাত্রছাত্রীদের প্রিয় সিরিজ—

* জটিল রহস্যভরা—**পিরামিড সিরিজ ও বিচিত্রা সিরিজ** *

● রক্তলোভী হিংস্র চতুর আততায়ীদের সঙ্গে বুদ্ধিমান গোয়েন্দাদের সংঘর্ষ।

পড়তে পড়তে নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসে এমনই ভয়াবহ

এই দুইটি সিরিজ পড়ুন !!! প্রতিখানি—২·০০

পিরামিড সিরিজ

চতুর জার্মান	[illegible]ার সিগন্যাল — ২·৫০	মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক মিষ্ট্রি
ষ্ট্রেঞ্জ উওম্যান	রেডিও ক্যামেরা	ডার্ক রুম
মিষ্টিরিয়াস ষ্টেজ	ইয়ং ফটোগ্রাফার — ২·৫০	ডিভোর্সড্ ওয়াইফ
বেডফোর্ড মার্ডার কেস	ফাদার এণ্ড সন্	টুইন ব্রাদার্স
গ্রীন হাউস	রুম নম্বর থার্টি	ওয়ার ক্রিমিন্যাল
বার্মিজ মিষ্ট্রি — ২·৫০	লষ্ট প্যারাশুট	টাইগারম্যান
সিলভার ড্রাগন	সিক্রেট সেফ	ডেসপারেট লেডি
টু মেনি মার্ডার্স	ডায়মণ্ড মাইনস — ২·৫০	অফিস মার্ডার
জাঙ্গল উওম্যান	পার্টনার্স ইন ক্রাইম	মিসড ওয়াইফ

বিচিত্রা সিরিজ

● গুপ্তধনের দুঃস্বপ্ন—৫·০০ ● বাঘরাজের অভিযান—৫·০০

● নিশাচরী বিভীষিকা—৫·০০ ● চতুর্ভুজের স্বাক্ষর—৫·০০

দেব সাহিত্য কুটীর ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯

Regd. No. W. B./E. C.—60

"Suktara"

ছোটদের বুক অব নলেজ

দেব সাহিত্য কুটীরের ছোট ও বড়দের জন্য বিশেষ ভাবে লেখা **এনসাইক্লোপীডিয়া** পরিমার্জিত [illegible] পরিবর্ধিত হয়ে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। [illegible] খানা রঙিনে ছবি।

ছোটদের বুক অব নলেজ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশ্বকোষ। দীর্ঘকাল ধরে অসংখ্য বিশেষজ্ঞ শিক্ষক, অধ্যাপক ও পণ্ডিতদের সহযোগিতায় এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে। নিজের ঘরে এবং লাইব্রেরীতে রাখার মত বই।

এই বই কাছে থাকা মানে সব প্রশ্নের উত্তর মেলা।
৫০্ টাকা পাঠালে রেজেস্টারী করে পাঠান হয়।

দাম ৫০/

দেব সাহিত্য কুটীর ২১ ঝামাপুকুর লেন কলি-৯